দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দেশ-জাতি-সমাজ রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণের উৎসব রাখিবন্ধন— পৃঃ ২৩

নতুন ভারতে দাসত্বের নিদর্শন মুছে শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচার — পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা।। ২৮ আগস্ট, ২০২৩।। ১০ ভাদ্র - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৮ আগস্ট - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'যাদবপুরের জঞ্জাল সরাতেই হবে' সকাল সেখানে রাতের চেয়েও অন্ধকার □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পঞ্চায়েতের ৬০ বনাম যাদবপুরের ১ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

অমৃত প্রয়াস : ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় পুনরুত্থান □ অখিলেশ মিশ্র □ ৮

যাদপুরের অরাজক পরিস্থিতি : দেশদ্রোহিতার দায় কেউ কি এড়াতে পারেন? □ বিশ্বামিত্র □ ১০

নতুন ভারতে দাসত্বের নিদর্শন মুছে শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচার □ ধর্মানন্দ দেব □ ১১

খালিস্তান আন্দোলন ইসলামিক সন্ত্রাসের সমান্তরাল অপশক্তি □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১৩

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা-সহ দেশের সকল গণহত্যার তদন্ত হওয়া জরুরি □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার দায় কি এড়াতে পারেন শিক্ষামন্ত্রী? □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৭

দেশ-জাতি-সমাজ রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণের উৎসব রাখিবন্ধন □ ড. প্রণব বর □ ২৩

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং রাখিবন্ধন □ রাজদীপ মিশ্র □ ২৬

এক ভারতীয় পরম্পরা রাখিবন্ধন □ অশোক কুমার ঠাকুর □ ২৮

জাতীয় সংহতি সাধনের এক বড়ো মাধ্যম রাখিবন্ধন □ সৌরভ সিংহ □ ৩১

সোদপুরের চক্রবর্তী পরিবারের সুপ্রাচীন মনসাপূজা □ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় □ ৩৩

শতবর্ষের প্রক্কালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিভ্রম □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

আগামী চার বছরেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে ভারত □ তারক সাহা □ ৩৭

কলকাতা রাজভবনে এখন সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার □ প্রবীর ভট্টাচার্য □ ৪৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অপসংস্কৃতি মুক্ত করতে হবে □ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ৪৪

ভ্রমণ : লাস্যময়ী স্ক্যানডিনেভিয়া □ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ খেলা : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯

প্রকাশিত হবে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

জন্মাষ্টমী— শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছিল মহাভারতের পাঞ্চজন্য। যার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল কুরুক্ষেত্রের রণভূমি। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের সেই পরম্পরা আজও ভারতবর্ষে বহমান। জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি। এদিন সারা ভারতবর্ষ তার অতি আপন কানহার জন্মতিথি পালন করে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় জন্মষ্টামী উপলক্ষে বিশেষ কয়েকটি রচনা থাকবে।

লিখবেন— গোপাল চক্রবর্তী, রবিব্রত ঘোষ, দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উৎসবের মূল লক্ষ্য অনুধাবণ করিতে হইবে

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। সংবৎসর এই দেশে উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। যদিও উৎসবের উদ্দেশ্য হইল আনন্দ লাভ। কিন্তু মূল লক্ষ্য হইল সমাজ সংগঠন। মানুষে মানুষে একাত্মতার ভাব নির্মাণ করিবার জন্যই উৎসবগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। ধীরে ধীরে মানুষ বিভিন্ন উৎসবকে তাহাদের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে। উৎসবে মানুষ নিজের ও পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমাজ অথবা দেশের সহিত একাত্ম হইয়া পড়ে। রক্ষাবন্ধন উৎসবটিও বহু প্রাচীনকালে সৃষ্ট একটি সামাজিক পর্ব। একসময় শুধুমাত্র ভগিনীরাই তাহাদের ভ্রাতাদিগের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া এই উৎসব পালন করিত। মুঘল-পাঠানের শাসনকালে যেকোনো ভগিনী যেকোনো ভ্রাতার হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে মান-সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করিত। ভ্রাতৃসকল প্রয়োজনে নিজ প্রাণের বিনিময়েও ভগিনীদিগকে রক্ষা করিত। কালক্রমে এই উৎসব নিজ পরিবারে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের দূরদর্শী মনীষীগণ ভারতবর্ষের উৎসবগুলিকে শুধুমাত্র পরিবার বা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া প্রয়োজনে রাষ্ট্র রক্ষার কার্যেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে লোকমান্য তিলক প্রমুখ মনীষী গণপতি উৎসবকে ব্যবসায়ীদের গদি হইতে বাহির করিয়া এবং শিবাজী উৎসবকে রায়গড়ের দুর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য জনগণের উৎসবের রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্রূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ রক্ষাবন্ধন উৎসবকে পবিবার হইতে বাহির করিয়া রাষ্ট্র রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, রক্ষাবন্ধনের যে তিথি শ্রাবণীপূর্ণিমা তাহাও অতিক্রম করিয়া অসময়ে তাহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কুচক্রী ইংরাজের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সেই রাখিবন্ধন উৎসব বঙ্গভূমি অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। রাখিবন্ধনের শক্তি অনুধাবণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেইদিন প্রমাদ গনিয়াছিল। তাহারা বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্র রক্ষার অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইদিন রাখিবন্ধনকে রাষ্ট্রীয় উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী প্রথম উৎসব পালনের মূল লক্ষ্য অনুধাবণ করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য,তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তোষণের মানসিকতায় জর্জরিত হইয়া ভারতবর্ষের উৎসবগুলিকে হিন্দুধর্মীয় উৎসব বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। তাই মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর পর যখন কুচক্রী ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষ বিভক্ত করিবার চক্রান্ত করিল, তখন তাহারা রক্ষাবন্ধনকে রাষ্ট্র রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিলেন না। ফলত দেশ বিভাজিত হইল। শুধুমাত্র স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবর্গই নহে, অধিকাংশ ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালি ভারতবর্ষীয় উৎসবগুলির মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছে। উৎসবগুলি আজ শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদ এবং মনোরঞ্জনের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা তাহা আসলে যে রাষ্ট্রমাতার পূজা বাঙ্গালি তাহা ভুলিয়া আড়ম্বর ও দম্ভ প্রকাশের অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। আনন্দের বিষয় হইল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতীয় উৎসবগুলিকে প্রথমাবধি সামাজিক রূপ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এবং তাহা বহুলাংশে সফলও হইয়াছে। তাহারই ফলশ্রুতিতে রক্ষাবন্ধন উৎসব আজ সমগ্র সমাজ ব্যাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমগ্র সমাজকে সঙ্গে লইয়া এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। প্রায় শতবর্ষের প্রচেষ্টায় ইহার ফলেই ভারত পুনরায় এক জাতি এক প্রাণ হইয়া উঠিতেছে। স্বয়ংসেবকদের সাধনার ফলেই ভারতবাসী আজ একাত্মতা অনুভব করিতেছে। রক্ষাবন্ধন উৎসবের ন্যায় সমস্ত উৎসব যত শীঘ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবে, ভারতরাষ্ট্রও তত শীঘ্র শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

সুভাষিতম্

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্ক পণ্ডিতৈ সহ মিত্রতাম্।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্বানো ন বিনশ্যতি।।

সৎ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক, জ্ঞানী লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং জ্ঞাতিজনদের সঙ্ঘে সুসম্পর্ক বজায় রাখা মানুষ কখনো বিপদে পড়ে না।

‘যাদবপুরের জঞ্জাল সরাতেই হবে’

সকাল সেখানে রাতের চেয়েও অন্ধকার

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

হত্যাপুর যাদবপুর। আমার আপনার পাপ। এটা মেনে নেওয়া দরকার যে আমরা সকলে মিলে নাবালক স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে হত্যা করেছি। নিরীহ প্রাণটির নির্মম হত্যায় প্রত্যক্ষভাবে যেমন যুক্ত কিছু ঔরস কলুষিত অপজাতরা, তেমন আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অকর্মণ্য উদাসীন কর্তৃপক্ষ আর শিক্ষামণ্ডলীও। সঙ্গে মমতা প্রশাসন আর তার পুলিশ। ‘আমি আর আপনি?’ অপ্রত্যক্ষ হলেও সব চাইতে বড়ো দোষী আমরা। কারণ যাদবপুরের যমালয়ে ঘটে চলা প্রতিদিনের অন্যায়ের পাহাড়ের আমরা নীরব দর্শক ছিলাম। প্রতিবাদের টুঁ শব্দটিও করিনি। আপোশ করেছি। কেন? অন্যায় মেনেও আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তানেরা দুধেভাতে থাকুক।

স্বপ্ন দেখা অন্যায় নয়। স্বপ্নদীপের বাবা তাঁর ছেলেকে ঘিরে সে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা হলেও তাই করতাম। তাহলে? ভুলটা কোথায়? ভুলটা স্বপ্ন দেখায় নয়। মোহে। সে মোহে তিনিও পড়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মোহ। ফলে সেই মোহের সবচাইতে বড়ো বলি তাঁকে দিতে হলো কয়েকটি মাতৃগর্ভের লজ্জা আর নরকের কীটের কাছে। এটা সবাই জানেন আর মানেন যে ওখান থেকে বহু কৃতী মানুষ শিক্ষা লাভ করেছেন। স্বপ্নদীপকে সেই শিক্ষা লাভের আশায় পাঠানো হয়েছিল। তবে কাদের তত্ত্বাবধানে! সেই মোহের ফাঁদেই পড়েছিলেন তাঁর বাবা। জানতেন না কারা সেই কর্তৃপক্ষ। তারা দু'কান কাটা নির্লজ্জ আর দায়িত্বজ্ঞানহীন একদল শিক্ষামণ্ডলী আর কর্তৃপক্ষ আর কিছু উঞ্ছ ছাত্র আর প্রাক্তনীর দল।

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। যেমন অন্য কেউ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। তবে যাদবপুরকে ঘিরে যে মোহগ্রস্ত আর মূর্খদের দল দেখেছি তাতে লজ্জাবোধ করি। শিক্ষালয়ের কাজ শিক্ষা দান করা, তার আবার মার্কা কী? প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ ‘এন আই আর এফ’ কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং তালিকা প্রকাশ করে। পাত্র চাই বা পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপনে যেমন নিজস্বীকরণের বড়াই থাকে এখানেও কোন কলেজের কী মান তা প্রকাশ করা হয়। এটা গোরু আর মোষের দাম নির্ধারণের মতো। কোন ছাত্রের কী মেধা তা বিচার করে সেই কলেজের র‍্যাংকিং বা অবস্থান। এর চাইতে লজ্জার আর হাস্যকর কিছু হয় না। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বা স্যার আইজ্যাক নিউটনকে আমরা অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারি। ঠিক সেই ফাঁদেই হয়তো পড়েছিলেন স্বপ্নদীপের বাবা।

> “যাদবপুর আজ নৈরাজ্যপুর, আতঙ্কপুর আর ‘হত্যাপুর’। যাদবপুরের সব জঞ্জাল সবাই মিলে সরাতে-ই হবে। তবেই সে ফিরে পাবে তার হারানো প্রতিষ্ঠার আসন।”

স্বপ্নদীপ স্বপ্ন পূরণের নামে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তাঁকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো বলি দিতে হলো কিছু পশুর হাতে। তিনি বোঝেননি যে যাদবপুরে শিক্ষার মুখোশ পরে কোন পশুরা বিরাজ করে। শ্রীঅরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, বিপ্লবী রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতে গড়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আজ হায়নাদের আনাগোনা। দেশবরেণ্য মানুষদের পদস্পর্শে ধন্য সেই মাটি আজ দেশবিরোধী, জিহাদি আর ভারতীয় সংস্কৃতির শত্রুদের দাপাদাপিতে কলুষিত। আমাদের নিশ্চুপ আর মদত ছাড়া এই প্রশাসনিক ক্লীবতা আর ওই ‘যমালয়’-এর অকর্মণ্যতা আর রাজনৈতিক অবিমৃশ্যকারিতা কোনোভাবে বৃদ্ধি পেত না।

দুঃখ একটাই। একটি নিরীহ নাবালক ‘দেবশিশু’র প্রাণের বিনিময়ে এতদিন ধরে ধামাচাপা পড়া এতগুলো অন্যায়ের ভাণ্ডা ফুঁড়ল বা প্যান্ডোরার বাক্স খুলল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে লালিত আর পালিত হওয়া চিহ্নিত হত্যাকারীদের চিনতে না পারা আমাদের প্রথম অপরাধ। তারা কারা? তারা দেশবিরোধী, জিহাদি, ভারতীয় সংস্কৃতির চরম শত্রু। তারা বাম আর অতিবাম মানসিকতার বিকৃত সন্তান। তাদের ইতিহাস লজ্জার আর বিশ্বাসঘাতকতার। এই শত্রুদের যদি আমরা আটকাতে না পারি তাহলে তাদের কৃত হত্যার দায় আমাদেরও নিতে হবে। এটাই সুনীতি। যাদবপুর আজ নৈরাজ্যপুর, আতঙ্কপুর আর ‘হত্যাপুর’। যাদবপুরের সব জঞ্জাল সবাই মিলে সরাতে-ই হবে। তবেই সে ফিরে পাবে তার হারানো প্রতিষ্ঠার আসন। শ্মশানে হবে সূর্যোদয়। □

পঞ্চায়েতের ৬০ বনাম যাদবপুরের ১

বামছাত্রীযু দিদি,

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

দিদি, চিঠির শুরুতেই দুটো কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। প্রথমত, আপনাকে কেন বাম ছাত্রী বলে সম্বোধন করলাম। দ্বিতীয়ত, শুরুতেই বহু প্রচলিত লঙ্কা ও রাবণের লোকপ্রবাদের উল্লেখই-বা কেন করলাম। আর চিঠির শিরোনামটার কথা তো অবশ্যই বলব। বরং সেটা দিয়েই শুরু করি।

এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোটামুটি প্রায় ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানি, আপনি বলবেন যে, আপনার দলের লোকেরাই বেশি মরেছে। আমি আগে যেটা বলেছি সেটাই আবার বলছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই কথা আপনার মুখে মানায় না। আপনি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী নন। আপনি এই রাজ্যের টানা তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা সকলেই এই রাজ্যের নাগরিক। মানে, তাঁদের সকলের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব আপনার। এখানে 'আমরা-ওরা' করার কোনো সুযোগ নেই। আরও একটা বিষয় হলো, সেই ৬০ জনের মৃত্যু নিয়ে যতটা হইচই হয়েছে তার চেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে বেশি হইচই হচ্ছে। সরকার, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম সকলেই করছে। প্রথম কারণ, ঘটনাটা কলকাতায় ঘটেছে। রাজ্যের রাজধানীতে কিছু ঘটলে তার অভিঘাত সমাজে বেশি পড়ে। দ্বিতীয় কারণ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মানেই যেন একটা দ্বীপ।, না, আগের কাশ্মীরের মতো। এখানে অন্য সব জায়গার নিয়ম চলে না। দেশের মধ্যে অন্য দেশ যেন। যেখানে নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠন বিনা বাধায় বিচরণ করতে পারে। যেখানে লেখাপড়ার উৎকর্ষের চেয়ে নেশার গবেষণা বেশি হয়।

কিন্তু দিদি, আমি পঞ্চায়েতের ৬০ জনের মৃত্যু আর যাদবপুরের এক পড়ুয়ার মৃত্যুর পেছনে একই কারণ দেখতে পাচ্ছি। আর সেই কারণেই আপনাকে 'বামছাত্রী' বলে উল্লেখ করেছি। আপনিও বামেদের থেকে যা শিখেছেন যোগ্য ছাত্রীর মতো তাই পালন করছেন। যেটা যাদবপুরের অভিযোগকারীদের ক্ষেত্রেও সত্য। ওই যে গোড়াতেই লিখেছি— যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

ক্ষমতা হাতে পেলে ক্ষমতার অপব্যবহারই আসলে স্বাভাবিক। আজ যে উঁচু ক্লাসের বা প্রাক্তন ছাত্রদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিঙের অভিযোগ উঠছে, প্রথমবর্ষে তারাই হয়েছিল র‍্যাগিঙের শিকার। আজ যে র‍্যাগিঙের শিকার হচ্ছে, উঁচু ক্লাসে উঠে সে-ই 'সিনিয়র' রূপে ফিরে আসবে র‍্যাগিং করতে। এ এক অমোঘ চক্র, যেখানে শিকারি ও শিকার, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন উভয়েই তাকিয়ে আছে সময়ের দিকে। ক্ষমতাবানরা একদা ক্ষমতাহীন ছিল বলেই আজ সুযোগ বুঝে 'হাতের সুখ' করে নিচ্ছে, আর ক্ষমতাহীনরাও জানে, শুরুর একটা বছর কোনোমতে পার করাই লক্ষ্য, তাদেরও শিকারি হয়ে ওঠা 'সময়ের অপেক্ষা'।

ভেবে দেখুন, রাজনীতিতেও এটাই হচ্ছে কিনা! আপনি বলেছিলেন ' বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু বদলা সংস্কৃতির বদল আনেননি। সেই এক ঘটনা। একদিন যারা মার খেয়েছিলেন, তারা আজ বদলা নিচ্ছেন। একদিন যারা ভোট রিগিঙের শিকার হয়েছেন, তারাই আজ রিগিং করছেন। একদিন যারা জোর করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দখলের বিরোধিতা করেছিলেন, তারাই এখন সেই কাজ হাসিমুখে করছেন। জবাব নেই এমন অনুকরণের! আপনি সত্যিই বাম রাজনীতির যোগ্য ছাত্রী!

আপনি বলবেন র‍্যাগিং আর রিগিং আলাদা। আমি বলব, না। আচ্ছা দিদি, বিজেপি করার জন্য যে চারজন জনজাতি মহিলাকে দিনের আলোয় বালুরঘাটের রাস্তায় দণ্ডি কাটানো হয়েছিল সেটা কি র‍্যাগিং নয়? যে মেয়েটিকে আপনি টিভির লাইভ অনুষ্ঠানে 'মাওবাদী' বলে দেগে দিয়েছিলেন সেটা র‍্যাগিং নয়? গ্রামে গ্রামে আপনার ভাইয়েরা নানাভাবে বিরোধী দলের সমর্থকদের যেভাবে হেনস্থা করে চলেছে যেটা কি র‍্যাগিং নয়?

যাদবপুরের ঘটনা জনমনকে আরও যে কারণে অবাক করেছে তা হলো, র‍্যাগিঙে জড়িত বা অভিযুক্ত ছেলেগুলি প্রায় সকলেই ছোটো শহর, মফস্সল বা গ্রাম থেকে আসা। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, হস্টেল কলকাতার বাইরের পড়ুয়াদের জন্যই। সেখানেই জুনিয়র-সিনিয়র সকলেই দূর শহর বা গ্রাম থেকে আসবেন। খাস কলকাতার কেতাদুরস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে গ্রাম মফস্সলের ছেলে-মেয়েরা খানিক জড়োসড়ো হয়েই থাকে। সেই কারণেই ছাত্রাবাসে জুনিয়র ছাত্রদের আরও আগলে রাখা, স্বস্তিতে রাখাই সিনিয়রদের দায়িত্ব। তারা যা সয়েছেন সেটা যেন তাদের নবাগত ভাই-বোনদের সহ্য করতে না হয়, সেই চেষ্টাই করবেন।

এ থেকে মুক্তির উপায় কী? দিদি, এখন সবাই রাজনীতি দিয়েই শেখে। কারণ সেটাই সমাজ। আমার মনে হয়, একদিন বিরোধীর আসনে থাকা রাজনৈতিক দল যতদিন না এলাকায় বিরোধীদের গণতন্ত্রের স্বার্থে আগলে রাখা শিখবে, প্রাপ্য সম্মান দেওয়া শিখবে, ততদিনে সমাজে এমন পরিস্থিতি থেকেই যাবে।

লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে কত মানুষ মারা যাবে? দোহাই দিদি, 'শূন্য' চাই। □

অতিথি কলম

অখিলেশ মিশ্র

অমৃত প্রয়াস

ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় পুনরুত্থান

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নরেন্দ্র মোদীর এই ৯ বছরের সময়কাল মহান ঐতিহাসিক অবদানসমূহের কারণে মনে রাখা হবে। ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রচীর থেকে জাতির উদ্দেশে তাঁর নবম অভিভাষণে ভারতের স্বাধীনতা লাভের এই ৭৫ বছর পূর্তির অমৃতকালে তিনি পঞ্চপণ বা ৫টি সংকল্পের উল্লেখ করেন। এই বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও সমন্বয় ভাবের প্রকাশযুক্ত ৫টি সংকল্প ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুত্থান এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম ও এখনও জীবন্ত মানবসভ্যতার স্তম্ভসমূহের স্থির উদ্দেশ্যমূলক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কার্যকরী। ওই পাঁচটি স্তম্ভ হলো যথাক্রমে— ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের তীর্থস্থানসমূহের পুনরুত্থান, জাতীয়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নতুন নিদর্শন স্থানসমূহের নির্মাণ ও সৃষ্টি, ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সমূহের সংরক্ষণ ও সংস্কার, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্য কিন্তু অজ্ঞাত বীর ও নায়কদের সম্মান জ্ঞাপন এবং সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যসমূহের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার।

ভারতীয় বিশেষত সনাতন ধর্মের স্থানসমূহের পুনরুত্থান :

ভারতবর্ষের জাতীয় অস্মিতা বোধের পরিচায়ক কোনো প্রকার আলোচনা যা একটি অপরাধ বলে পরিগণিত হতো, বিগত সাত দশক ব্যাপী স্থায়ী সেই ঔপনিবেশিক মনসিকতার পরিবর্তন নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছরের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। মোদীজী হলেন সেই প্রধানমন্ত্রী যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে, সাংবিধানিক নির্দেশকে শিরোধার্য করে সনাতন ধর্মের আবহমানকালীন নিরবচ্ছিন্নতার প্রেক্ষিতে দ্বিধাহীন ভাবে এই ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ হওয়া সম্ভব। সেই লক্ষ্যে অধুনা সংস্কারিত ও নবরূপে সজ্জিত কেদারনাথ ধাম, কাশীবিশ্বনাথ ধাম, কর্তারপুর সাহিব, পাওয়াগড়, উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির, চেন্নাইয়ের মহাবলীপুরমে সমুদ্র তীরস্থিত মন্দির সমূহ, সোমনাথ ধাম ও কাশ্মীরের শীতলনাথ মন্দির হলো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি রূপান্তরিত মনোজগৎ এবং পরিবর্তিত বাস্তব ভূচিত্রের কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ৫ আগস্ট, ২০২০ দিনটি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুঘলদের ভারতে আগমন ঘটে ও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তারা মিলিয়ে যায়। এরপর পর্তুর্গিজ, ওলন্দাজ, ফরাসিদের আগমন ও প্রস্থান প্রত্যক্ষ করে ভারতবর্ষ। আফগান ও পারসিরা নানা সময়ে ভারত আক্রমণ করে ও হারিয়ে যায়। এরপর আসে ব্রিটিশ। তাদের রাজত্বকাল বেশ কিছু বছর স্থায়ী হয় এবং এরপর ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হয়। জওহরলাল নেহরু প্রবর্তিত ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের প্রথম ছয় দশক ব্যাপী জারি থাকলেও সেই সময়ের পরে এই অন্তঃসারশূন্য,ভঙ্গুর ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধসে পড়ে।

এই বিশ্বব্যবস্থা অতীতে লিখিত হয়েছে, পরে তা পুনরায় লেখা হয়েছে এবং এখন ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী পর্যায়ে বিগত ৪৯৫ বছর ধরে এই বিশ্বব্যবস্থা আবার লিখিত হচ্ছে। এককালে সাধারণ প্রচলিত মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা ছিল চিরস্থায়ী প্রায় অর্ধ সহস্রাব্দ ধরে প্রবহমান সময়ের মরুবালিরাশিতে সেই চিন্তাধারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের চিরপ্রবহমানতার সঙ্গে যা হারিয়ে যায়নি তা হলো শ্রীমর্যাদা পুরুষোত্তমের রাজত্ব ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা। অমানিশাসম ঘনিয়ে ওঠা একের পর এক শতাব্দী, আকাঙ্ক্ষিত ও সংঘটিত বলিদানসমূহ এবং সভ্যতা- সংস্কৃতি রক্ষায় এই ভয়াবহ যুদ্ধ সময়ের দীর্ঘ সরণি বেয়ে নানাভাবে অসম ও অলঙ্ঘ্য মনে হলেও তবুও সেই আস্থা ও বিশ্বাস অটল, অক্ষয়, অজেয় থাকে। ২০২০ সালের ৫ আগস্ট দিনটি সেই আস্থা ও বিশ্বাসের নজির স্থাপনের এক অখণ্ড প্রমাণ। ১৯৯০ সালে ঐতিহাসিক রামরথ যাত্রার মাধ্যমে যা সূচিত হয়, পরবর্তীকালে ৫ আগস্ট, ২০২০ দিনটিতে ভূমিপূজন দ্বারা সঠিকস্থানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তার শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। অগণিত ভক্তের পুজো নিবেদনের মহতী সুযোগদানের মধ্য দিয়ে এই নিরন্তর প্রয়াসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনরায় ভগীরথের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন যা ২০২৪ সালে পবিত্র শ্রীরাম জন্মভূমিতে ভব্য রামমন্দির স্থাপনের মহান ইতিহাস রচনা করবে।

প্রায় ৫০০ বছর আগে মামুদ বেগাড়া পাওয়াগড়ের প্রাচীন মন্দির আক্রমণ করে ও মন্দিরের শিখর ধ্বংস করে। এই কারণে শিখরে মন্দিরধ্বজ উত্তোলন সম্ভবপর ছিল না। ধ্বংসের পাঁচশো বছর ও স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনর্গঠিত এই মন্দিরে শীর্ষধ্বজ উত্তোলন করেন। রানি অহল্যাবাঈ হোলকারের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি ইঞ্চিতে কাশীবিশ্বনাথ ধামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে ও মন্দিরের চারপাশে আক্রমণকারী, হানাদারদের সব চিহ্ন মুছে ফেলার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন।

জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নতুন নিদর্শন সমূহের নির্মাণ :

জাতীয় চেতনা ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান জ্ঞাপন করে গুজরাটে দ্য স্ট্যাচু

অব ইউনিটির নির্মাণ এই নতুন নিদর্শন স্থাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্গত ভূখণ্ডকে জাতীয় সংহতির প্রেক্ষিতে এক ঐক্যবদ্ধ রূপদান করে সর্দার প্যাটেল সেই ভূখণ্ডকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার সোপান রচনা করে এক অনন্য ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন। সর্দার প্যাটেলের এই সুউচ্চ, সুবিশাল মূর্তির মাধ্যমে অগণিত ভারতবাসী যাঁরা ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেন তাঁদের উদ্দেশে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কিন্তু ভারতকে এক সুসংগঠিত রূপদানকারীর মূর্তি স্থাপন ছাড়াও দিল্লিতে ভারতের পরম্পরাগত ঐতিহ্যসম্পন্ন সেঙ্গোল স্থাপিত হওয়া নতুন সংসদভবন নতুন নামে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ রূপে কর্তব্য পথ, ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল ও নবরূপে নির্মিত ভারতমণ্ডপম প্রভৃতি জাতীয় সৌধসমূহ ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার অনুসারী নতুন ভাবে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ ও সংস্কার :

উন্নত সিন্ধুসভ্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন, বহু দশক ধরে যে ঐতিহাসিক স্থানটি ছিল চরম উপেক্ষিত --- সেই ধোলাবীরার গুরুত্ব বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ার দরুন আজ প্রাপ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। ধোলাবীরায় বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ সেচব্যবস্থা গড়ে ওঠার দরুন কৃষিকাজে গতি এসেছে এবং হস্তশিল্প ও পর্যটন শিল্পের বিকাশলাভের কারণে কচ্ছের অর্থনৈতিক প্রসারলাভ হয়েছে। কচ্ছ এখন একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র এবং ধোলাবীরা একটি ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

অসমের শিবসাগর, হরিয়ানার রাখিগড়ি, হস্তিনাপুর বা তামিলনাড়ুর আদিচেনাল্লুর সর্বত্র প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান লাভ করেছে।

বীর নায়কদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন :

সম্মান জ্ঞাপনের ও জাতীয় অস্মিতার স্বার্থে ভারতীয় জীবন দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ সংস্কার ছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধের অজানা অজ্ঞাত বীর নায়কদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেও প্রধানমন্ত্রী মোদীজী অঙ্গীকারবদ্ধ। বীর সাভারকরের স্মৃতিধন্য সেলুলার জেলের পুনঃসংস্কার হলো তার অন্যতম উদাহরণ। এই জেলের যে কক্ষে বীর সাভারকর ব্রিটিশদের হাতে বন্দি ছিলেন সেই স্থানটি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবাদী জনগণের কাছে আজ এক তীর্থক্ষেত্র, যেখানে ভারতজননীর এই মহান সন্তানের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আভূমি প্রণাম নিবেদন করেছেন। ২০১৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিপ্লবীদের স্মৃতিসৌধে মাল্যদান করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন— যে এই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের অনাবিল, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক প্রতীক নয়, এই স্থান সমস্ত ভারতবাসীর কাছে এক তীর্থক্ষেত্র যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃঢ় সংকল্পের বাণী আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৪৩ সাল এই দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন ভারতীয় ভূখণ্ড ঘোষণা করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেখানে প্রথমবার ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে ৭৫ বছর পর কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই বীরগাথার পর্ব ভারত সরকার সেইদিন স্মরণ না করলে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এই বিষয়ে চির অজ্ঞাত থাকতো। নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন অঞ্চলে এককালে ব্রিটিশরাজের মূর্তির এক অপমানজনক অবস্থান ছিল। সেই স্থানে আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয় যে, এই ভারত এক নতুন ভারত যেখানে ভারতীয়রাই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

মুম্বাই রাজভবনে বিপ্লবীদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত মিউজিয়াম বা বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নশ্বর দেহাবশেষ ভারতে নিয়ে এসে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি মিউজিয়াম বা নয়াদিল্লিতে নির্মিত ক্রান্তি মন্দির— প্রমাণ বহন করে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট পরিবারের একচেটিয়া বিষয় নয়।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্মৃতিবিজড়িত ৫টি স্থানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা 'পঞ্চতীর্থ' ভারতবর্ষের এই পুনরুত্থানকে চিহ্নিত করে এবং ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের স্মৃতিকে স্মরণ করে এই পুনরুত্থানের প্রতিষ্ঠা করে। এই মহান ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের প্রকৃত নায়ক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক অসীম প্রেরণার উৎস। বাবাসাহেবের জীবন মানবিক জীবনবোধ ও সমস্ত বাধা জয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পঞ্চতীর্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাবাসাহেবের অসামান্য কর্মক্ষমতা বিষয়ে সম্যক শিক্ষা প্রদান করবে।

জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন সমূহের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার :

ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিও হয়েছে ব্যাপক ভাবে সংস্কারিত। পরাধীন ভারতে, দেশবাসীর জাগরণের ও প্রতিবাদের এক মূর্ত প্রতীক হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ, যা সেই দিনের এক জাতীয় বিপর্যয়ের মর্মান্তিক কাহিনিকে উপস্থাপন করে। পরিতাপের বিষয় যে এই স্থান এত বছর যাবৎ ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ১৯১৯ সালের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতিকে পূর্ণ মর্যাদায় সংরক্ষণ করে এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের মূল কাঠামোর পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। এই স্থানে বর্তমানে ৪টি গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পঞ্জাবের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে যথার্থভাবে বর্ণনা করে। এর সঙ্গে তিনমূর্তি হাইফা চক পুনঃসংস্কারিত হয়ে ভারতীয় সেনার অধীন ৩টি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই বাহিনী ১৯১৮ সালে হাইফা যুদ্ধে জয়ী হয়। এই হাইফাচক ভারত-ইজরায়েল মৈত্রীর প্রতীক। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে গুজরাটের সবরমতী আশ্রমের সংরক্ষণ ও জতীয় লবণ সত্যাগ্রহ সৌধ নির্মাণ তার মূলভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের প্রচারকে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু এইসব সাফল্যকে অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত প্রয়াস ও পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ভারত থেকে চুরি যওয়া প্রত্নসম্পদ সমূহের পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরকম ৪০০-রও বেশি প্রত্নশিল্পসামগ্রী ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যা ভারতীয় মন্দির ও সংগ্রহশালাগুলিতে আজ তাদের উচিত স্থানলাভ করেছে।

(লেখক ব্লুক্রাফ্ট ডিজিটাল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সিইও)

যাদবপুরে অরাজক পরিস্থিতি

দেশদ্রোহিতার দায় কি কেউ এড়াতে পারেন?

ছাত্র খুনের ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজক পরিস্থিতি প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কি জানা ছিল না? বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপির অনুষ্ঠানে তৎকালীন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হেনস্থা, তাঁকে উদ্ধার করতে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে যাওয়া কিংবা অন্য কলেজের এক অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হেনস্থা ও তাঁকে জোর করে আটকে রেখে শ্লীলতাহানির মিথ্য মামলা দেওয়া— অতি সাম্প্রতিক অতীতে যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের ঘৃণ্য আচরণ বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। এখন বাংলা বিভাগের ছাত্র স্বপ্নদীপকে খুনের ঘটনায় প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ নড়েচড়ে বসায় বিষয়টি অনেক বেশি আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে মানুষকে এও ভাবাচ্ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপের মতো কত অজস্র ছাত্রের স্বপ্ন নিভে গিয়েছে। এর দায়িত্ব নেবে কে? সবাই এক কথায় উত্তর দেবেন অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোনো সন্দেহ নেই বিশ্ববিদ্যালয় এই বর্বরোচিত হত্যার দায় এড়াতে পারে না। তবে একইসঙ্গে যাদবপুরের সাম্প্রতিক পরম্পরাটাও মাথায় রাখা দরকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে যখন হেনস্থা করা হচ্ছিল, হেনস্থাকারীরা বামপন্থী বুঝে তিনি তাদের নিবৃত্ত করতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদাহরণ টেনেছিলেন, বলেছিলেন, 'তোমরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দলের লোক হয়ে আমার গায়ে হত তুলছো'। তখন বিক্ষোভকারী এক ছাত্রনেতা বলেছিল, 'আমরা সিপিএম নই, আমরা নকশাল'। যাদবপুরের শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়ায় গলদটা এখান থেকেই খুঁজতে হবে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, র‍্যাগিং সব বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়, কিন্তু তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি কাম্য নয়। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের একাংশও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিঙের উদাহরণ তুলে ধরে যাদবপুরের অপরাধকে কিছু লঘু করে দেখাতে বা একে আদৌ ব্যতিক্রমী নয় দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মামুলি র‍্যাগিঙের নৃশংস নমুনা হিসেবে এই ঘটনাকে বর্ণনা করলে খুব ভুল হবে।

ঘটনার পরে কিছু ছাত্র-সংগঠনের নাম সামনে এসেছে, যেমন ডবলিউ টি আই, ডিএসএফ ইত্যাদি। পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যেতে পারে ডবলিউ টি আই নামক ছাত্র-সংগঠনটি মোটামুটি নয়ের দশকের গোড়ায় মূলত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৈরি। আরেকটি সংগঠনের নাম ডিএসএফ, অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফ্রন্ট, এটি তৈরি হয় সাতের দশকের শেষে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংগঠনগুলি যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা তৈরি, কোনোভাবেই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, নিজেদের নিরপেক্ষ বলেও এরা দাবি করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, এদের মধ্যে অতি বাম মনোভাব প্রবেশ তো করেছেই, এমনকী যাদের নকশাল বলে থাকি তাদের দ্বারা এরা পরিচালিতও হয়। এক বিজেপি নেতা বলেছেন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের ঠিকানা, তাদের নেতাদের হদিশ চাইলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এদের নেতা কে কেউ জানে না। এদের ঠিকানার খোঁজও পাওয়া দুষ্কর। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সঠিকভাবেই দাবি করেছেন, এদের পেছনে চীনালগ্নি আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখতে। কারণ বিদেশি তহবিল ছাড়া দেশবিরোধী কাজে এদের বিপুল বরাদ্দের উৎস কী? আর এই কাজে নবাগত, নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগাতে, এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভয়াবহ র‍্যাগিং চালানো হয়। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে সেই র‍্যাগিঙের ভয়াবহতা প্রকাশ্যে আসছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক প্রাক্তন উপাচার্য রাতের বেলায় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিজে নজরদারি করতেন। সর্বত্র সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। তাঁকে ছাত্র-বিরোধী বলে দেগে দিয়ে তাঁর বিদায়ের ব্যবস্থা সেদিন পাকা হয়েছিল। এর দায় আজকের শাসক থেকে সেদিনের বিরোধী সিপিএম-কেউই এড়াতে পারে? আজকেও সিসিটিভির ব্যবহার করতে দিতে নকশালপন্থীদের প্রবল আপত্তি, পাছে তাদের কুকীর্তি ধরা পড়ে? আজ এসএফআই মুখে বিশ্ববিদ্যালয় ও হোস্টেল চত্বরে মুখে সিসিটিভি লাগানোর কথা বললেও সেদিন তারা কিন্তু এর বিরোধিতাই করেছিল এবং আজও দ্বিধাগ্রস্ত।

শুধুমাত্র উচ্চমেধার জায়গা বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার দায় সিপিএমও এড়াতে পারেনি। একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। এর অতীতের জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে মুছে দিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী বাম, বন্দুকের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে ইচ্ছুক বামেরা তাদের কায়েমি স্বার্থকে বহুদিন ধরে কাজে লাগিয়েছে। আজকে স্বপ্নদীপের মৃত্যু ও বিভিন্ন নকশালী ছাত্রনেতার গ্রেপ্তার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের অরাজকতাকে বেআব্রু করে দেওয়ায় বিষয়টা প্রকাশ্যে এসেছে। মেধার অজুহাতে অর যাইহোক, ক্যাম্পাসে দেশবিরোধী কার্যকলাপকে সমর্থন করা যায় না। এই বাস্তবটা প্রত্যেকের বোঝার সময় এসেছে। □

নতুন ভারতে দাসত্বের নিদর্শন মুছে শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচার

ধর্মানন্দ দেব

ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে এখনো চলছে সেই ব্রিটিশ আমলের শাসন। ব্রিটিশ আমলের তিনটি ফৌজদারি আইনে বদল আনছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। আর থাকছে না 'ঔপনিবেশিক' ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৮৬০ বা আইপিসি। একই সঙ্গে বিলুপ্ত হতে চলেছে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর ১৯৭৩ বা সিআরপিসি (এটি ব্রিটিশ সংসদে প্রথম পাশ হয় ১৮৮২ সালে) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ বা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। এই তিনটি ব্রিটিশ আমলের আইনের পরিবর্তে গত ১১ আগস্ট নতুন আইন আনার লক্ষ্যে সংসদে তিনটি বিল পেশ করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে এখনও পাশ হয়নি। আরও পর্যালোচনার জন্য এই তিনটি বিল পাঠানো হয়েছে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে।

ঔপনিবেশিকতার চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে ভারতের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমকে ঢেলে সাজাতে একাধিক ধারা বদলের প্রস্তাব রয়েছে এই বিলগুলিতে। পেশ করা বিল অনুযায়ী, ১৮৬০ সালের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এবার হতে চলেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। সিআরপিসি বদলে গিয়ে হবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট বদলে হবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। বিশদ আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব না হলেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার গুরুত্বপূর্ণ নতুন ধারাগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনের প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। যাতে সেগুলো প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতি এবং সমাজের বর্তমানের পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এই সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেই ২০২৩ সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিলে রয়েছে মোট ৩৫৬টি ধারা। আগে ছিল ৫১১টি ধারা। নতুন বিলে ১৭৫টি ধারা আইপিসি থেকে এনে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়েছে। আইপিসি-র ২২টি ধারা বাতিল করা হয়েছে এবং ৪টি ধারা নতুন সন্নিবেষ্টিত করা হয়েছে।

আইপিসি-র ধারা ফোর টোয়েন্টির কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। 'ফোর টোয়েন্টিদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।' অথবা 'সাবধান, লোকটা কিন্তু ফোর টোয়েন্টি নম্বর ওয়ান, ওকে টাকা ধার দিও না!' ঠগ, জোচ্চোর, জালিয়াতদের সম্পর্কে এরকম শ্লেষাত্মক বিশেষণ কিন্তু আর দেওয়া যাবে না নতুন বিল আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর। কারণ, মার্কামারা প্রতারকদের জন্য বরাদ্দ এই পরিচয় আগামীদিনে আর প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত হবে না। ১৮৬০ সালে তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রতারণা ও জালিয়াতির অপরাধে ৪২০ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করাই নিয়ম। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় সমাজে চারশো বিশ এবং প্রতারক হয়ে উঠেছে সমার্থক! কিন্তু নতুন বিল থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতারণার অপরাধে আর ৪২০ নম্বর ধারা প্রযোজ্য হবে না। তা সম্পূর্ণ বাতিল। প্রতারণার অপরাধে নির্ধারিত হতে চলেছে ন্যায় সংহিতার ৩১৬ নম্বর ধারা। সুতরাং এই বিল আগামীদিনে যখন সংসদে পাশ হয়ে নতুন আইন হয়ে যাবে, তখন থেকে প্রতারকদের চারশো বিশের বদলে তিনশো ষোলো আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪২০ ধারা অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে অসাধুভাবে প্রতারণা এবং প্ররোচিত করা অপরাধযোগ্য। এতে সাত বছরের কারাবাস হতে পারে, সঙ্গে মোটা টাকা জরিমানাও। তবে ২০২৩ সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিলের ৩১৬ ধারার ২, ৩ ও ৪ নম্বর উপধারা অনুযায়ী প্রতারকের তিন, পাঁচ কিংবা সাত বছরের সাজা হতে পারে। হতে পারে মোটা জরিমানাও।

আগে 'টেররিজম' বা সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু নতুন বিলে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে শুধুমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা যাবে এবং যাবজ্জীবনের শাস্তি কাউকে দেওয়া হলে তার মেয়াদ সাত বছর উত্তীর্ণ হলেই শাস্তি মাফ সম্ভব।

শুধু ৪২০ নয়, একই হাল ৩০২ ধারারও। এতদিন রায়দানের সময় বিচারকদের মুখে দফা ৩০২ অনুযায়ী হত্যার অপরাধে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবনের সাজা ঘোষণা শুনে আসামিদের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। কিন্তু নতুন বিলে ৩০২ নম্বর ধারার অর্থ হচ্ছে ছিনতাইয়ের মতো মামুলি অপরাধ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবনের সাজা হয়। সেক্ষেত্রে ২০২৩ সালের ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, ৩০২ (১)-এ পড়ছে ছিনতাই। এদিকে, খুনের অপরাধ আসছে ধারা ৯৯-এর আওতায়। যদিও কালপেবল হোমিসাইড এবং খুনের সাজা পৃথক করা হয়েছে। ১০১ ধারার দুটি উপধারা

ফঃ ২

রাখা হয়েছে। যেখানে ১০১ (১) অনুযায়ী, খুনের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১০১ (২)-এ প্রস্তাব করা হয়েছে, একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে কাউকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করলে তাদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। গণপিটুনিও এই ধারার আওতাতেই পড়ছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধীর যাবজ্জীবন সাজা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, এই ধারা বদলে হয়ে যাবে ডাকাতির অপরাধ। খুনের চেষ্টা পড়বে ১০৭ ধারার আওতায়। নারীদের শ্লীলতাহানি অন্যতম জঘন্য অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়ে এসেছে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন। এবার তা আরও কঠোর হচ্ছে এবং পরিধিও বেড়ে যাচ্ছে। ধর্ষণের অভিযোগ মানেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ নম্বর ধারাই এতদিন ছিল দস্তুর। এবার তাও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। নতুন ধারা হবে ৬৩।

পাশাপাশি নারীদের জন্য থাকছে একাধিক আইনি সংস্থান। যে কোনও মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সহবাসের ক্ষেত্রে এবার হবে ১০ বছরের জেল। ন্যায় সংহিতায় বলা হয়েছে, কাজ পাইয়ে দেব, বিয়ে করব, চাকরিতে প্রোমোশনের ব্যবস্থা করব, পুরস্কার পাইয়ে দেব ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদের সঙ্গে সহবাস ও প্রতারণায় এই কারাদণ্ড নিশ্চিত। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, সত্য পরিচয় গোপন করে অর্থাৎ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে মহিলাকে বিবাহ করলে ১০ বছরের জেল। ঘৃণা ভাষণের মতো অপরাধ দেশে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এবার ঘৃণা ভাষণ রুখতে কড়া শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। নতুন বিলের ১৯৫ ধারা অনুসারে হেট স্পিচ ছাপলেও সংবাদপত্রের উপর পর্যন্ত নেমে আসবে আইনের খাঁড়া। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে যদি কেউ ভুয়ো খবর বা ফেক নিউজ ছড়ায়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও ১৯৫ ধারার আওতায় পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এই বিধির আওতায় অপরাধীকে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাবাসের সাজার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও জরিমানার সাজা রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে জরিমানা ও সাজা দুটিই হতে পারে।

বলা হচ্ছে, কেউ যদি 'বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা' তথ্য তৈরি করে বা প্রকাশ করে 'দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য, নিরাপত্তা' ক্ষুণ্ণ করে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ করা হবে। নতুন বিল অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সি মহিলাকে ধর্ষণের সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা আজীবন কারাদণ্ড। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ২০ বছর থেকে আজীবন জেলের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এমনকী, মহিলাদের হার বা মোবাইল ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার বিচারের জন্য রয়েছে নয়া আইন। যৌন হিংসার মামলার ক্ষেত্রে নির্যাতিত মহিলার বয়ান তাঁরই বাড়িতে একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নথিবদ্ধ করার কথাও জানাচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারায় থাকা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের এই ধারা বদলে যাবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায়। সেখানে ১২০ ধারার আওতায় পড়বে উসকানির জেরে গুরুতর আঘাতের মতো অপরাধ।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির কথা বলা হয়েছিল। নতুন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির কথা বলা হয়েছিল। নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, মানহানি পড়বে ৩৫৪ (১) ধারার আওতায়। ভবিষ্যতে সরকারিভাবে রাজদ্রোহ আইন না থাকলেও তাঁর স্থান নেবে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন। নতুন বিলে ১৫০ নম্বর ধারায় এই আইনের উল্লেখ থাকছে। যেখানে বলা হয়েছে, বাক্‌স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া হলেও যদি কেউ দেশ বিরোধী কোনও কথা বলে যা ভারতের অখণ্ডতা, একতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পরিপন্থী হয় তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। দেশে উত্তেজনা ছড়ানো, অস্থিরতা তৈরি বা বিভাজনমূলক সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের কোনও ঘটনা ঘটলে বা তার চেষ্টা হলে এই আইন প্রযোজ্য হবে। এই ধারায় উল্লেখ রয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে, লিখিতভাবে, বক্তৃতার মাধ্যমে, দৃশ্যকল্প মাধ্যমে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যদি দেশের অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনও কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে সেক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে। এই রাষ্ট্রদ্রোহের সাজা হবে নূন্যতম ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত। প্রস্তাবিত আইনে রাষ্ট্রদ্রোহের সংজ্ঞায় যোগ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা, সশস্ত্র বিদ্রোহ, অন্তর্ঘাতমূলক— এই শব্দগুলি। বর্তমানে যে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন চালু আছে, তাতেও যাবজ্জীবন বা তিন বছরের সাজার কথা রয়েছে, সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে অপরাধীর।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিলে আপাতদৃষ্টিতে ৩০৯ নম্বর ধারাটিকে সরানো হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু এটি আত্মহত্যার চেষ্টা করাকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধমুক্ত করেনি। প্রস্তাবিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনও ব্যক্তি কোনও সরকারি কর্মচারীকে তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার জন্য বা বাধা দেওয়ার অভিপ্রায়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁকে এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ের সঙ্গে সমাজের সেবার সাজা দেওয়া যাবে।' এই ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টাকে নতুন বিলেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবেই রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হিসেব বলা যেতে পারে, একজন প্রতিবাদকারী যদি অন্য বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করা থেকে পুলিশকে বিরত রাখতে আত্মহননের চেষ্টা করেন, তবে তা সাজা হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ২২৪ শাস্তি হিসেবে সমাজসেবার কথা বলেছে, যা আইপিসি ৩০৯ ধারায় নেই। সংগঠিত অপরাধ' এবং 'আন্তর্জাতিক গ্যাং'-এর ক্ষেত্রেও নতুন বিল কঠোর। অভিযোগ প্রমাণ হলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আগে 'টেররিজম' বা সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু নতুন এই বিলে আরও বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে শুধুমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা যাবে এবং যাবজ্জীবনের শাস্তি কাউকে দেওয়া হলে তারা মেয়াদ সাত বছর উত্তীর্ণ হলেই শাস্তি মাফ সম্ভব।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের দাসত্বের প্রতীক ছিল ১৮৬০ সালের আইপিসি এবং ১৯৭৩ সালের সিআরপিসি। শাস্তি দেওয়াই ছিল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা নয়। কিন্তু নতুন আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয় তা ভবিষ্যতে জানা যাবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

খালিস্তান আন্দোলন ইসলামিক সন্ত্রাসের সমান্তরাল অপশক্তি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রামায়ণে পড়েছিলাম, মুনিঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন— দানব ও রাক্ষসরা পম্পা সরোবর থেকে মন্দাকিনী নদীর তীরে পর্যন্ত তাণ্ডব করছে। তারা গুপ্ত প্রক্রিয়ায় অখণ্ড সাধনায় বিঘ্ন করতে চাইছে। বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে :

এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে।। (৩ : ১ : ১৬)

গুপ্ত শত্রু আমাদের দেশে সে যুগ থেকেই রয়েছে। যে গুপ্ত শত্রুরা আধুনিককালে দাবির আন্দোলনের মোড়কে রাক্ষসকুলের মতোই রাষ্ট্রীয় অখণ্ড মর্যাদা হানা দেয়। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তারাই যারা এ দেশকে নানান কুযুক্তিতে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে পেতে চায়। যারা মুনিঋষির পুণ্যভূমি ভারতের প্রতি অবিশ্বাসী। যারা জড়বিশ্বাসী, যারা সন্ত্রাস তৈরি করে। যারা এ দেশের মাটিতে খালিস্তান প্রদেশের দাবি চেয়ে দশকের পর দশক গুপ্ত সহিংসতার পটভূমি প্রশস্ত করে। এই খালিস্তান আন্দোলনকারী বা সন্ত্রাসীরা কি আদৌ ভারতীয়? কে দেয় তাদের মদত? কেমন করে আসে বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তের অর্থ রসদ? শুধু তো আর পঞ্জাব প্রদেশের খালিস্তানিদের বিশুদ্ধ শিখ প্রদেশ গঠনের দাবি নয় এটা। সে দাবি শুরুতে ছিল। কিন্তু তার মোড়, প্রকৃতি, পরিধি, চরিত্র আজকে আর দাবির পর্যায়ে নেই। তার চরিত্র সন্ত্রাসে রূপান্তরিত।

খালিস্তানি আন্দোলন আজ আর ভারতের আন্দোলন নেই। তা দূষিত বাতাস পাচ্ছে বিদেশ থেকে। যার শুরুটা হয়েছিল ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার আগেই। শুধুমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিয়ে খালিস্তান গঠনের দাবি থাকলেও ১৯৮০-৯০-তে তা হিমাচল, হরিয়ানা এমনকী রাজস্থানেরও কিছু অংশ দাবি করতে শুরু করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই শিখদের জন্য পৃথক দেশ বা অন্তত পক্ষে পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানাল শিরোমণি অকালি দল। ১৯৬৬-তে সে দাবি মানেন ইন্দিরা গান্ধী সরকার। এরপরেই যত বিপত্তি। পঞ্জাব বিধানসভায় অকালি দল পরাজিত হলো। ১৯৭৩-এ চণ্ডিগড়কে পঞ্জাবে ফিরিয়ে দেওয়া-সহ আরও বেশ কিছু দাবি নিয়ে সরব হয় আনন্দপুর সাহিব। আন্দোলন গতি পেল ১৯৮২-তে জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালের আকালির সঙ্গে হাত মেলাতেই। যদিও এর আগেই ১৯৭০-এ বার্কিংহামে প্রথম খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে দবিন্দর সিংহ।

ওই বছরেই পঞ্জাব বিধানসভায় পরাজিত হয়ে অকালি নেতা জগজিৎ সিংহ চৌহান লন্ডনে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন খালিস্তানি প্রদেশের স্বপক্ষে। তারপর আর এক মোড়, ১৯৭১, ভারত-পাক যুদ্ধের পরেই খালিস্তান নামটি আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত হলো। কে করাল পরিচয়? তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঘোষণা করলেন খালিস্তান গঠনে পূর্ণ সহায়তা করবেন। শুধু এখানেই শেষ না, নানকানা সাহিবকে খালিস্তানের রাজধানী পর্যন্ত করার আশ্বাস দেন। অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকায়। প্রবাসী শিখরা মিলিয়ন ডলার উপহার দিতে শুরু করলেন। ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনার বীজ লালিত হচ্ছিল ১৯৭৯ থেকেই ব্রিটেনে। যখন খালিস্তান কাউন্সিল গঠিত হলো। পরের বছরই ব্রিটেনের সমর্থনে অমৃতসর খালিস্তান দেশ গঠনের ডাক দিল। তৈরি হলো খালিস্তানি পাসপোর্ট, ডাকটিকিট। জর্নেল সিংহ এবং চোহান দ্বৈরথ কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে ধর্মতান্ত্রিক শিখ দেশ গঠনের সংগঠন প্রস্তুত করছেন। খালিস্তান আন্দোলন থেকে ক্রমশ জঙ্গিবাদে রূপান্তরিত হলো। যে কাজে পাকিস্তানের এত আগ্রহ, তাই আর বুঝতে অপেক্ষা থাকে না সেই কাজের প্রকৃতি ঠিক কতটা সুস্থ এবং গঠনমূলক হতে পারে। ১৯৮০-তে আকালি দল ব্যাপক নাশকতা ও হত্যাকাণ্ড চালায়। ধীরে ধীরে জঙ্গিবাদ ভারত এবং বাইরে বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল, ভিন্দ্রানওয়ালে টাইগার ফোর্স অব খালিস্তান, ভিন্দ্রানওয়ালে টাইগার ফোর্স, খালিস্তান কমান্ডো ফোর্স, খালিস্তান লিবারেশন, দশমেশ রেজিমন্ট, শহিদ খালসা বাহিনী এমন সব জঙ্গি, আধা জঙ্গি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শক্তিতে বলবান হতে থাকল।

আজ যদি জিজ্ঞাসা আসে, খালিস্তানি আন্দোলনের শক্তি উৎস কোথা থেকে আসছে? তবে উত্তর হবে— ঠিক যে পদ্ধতিতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে টুকরে টুকরে গ্যাং অপশক্তির প্রদর্শন করেছে,

তেমনই সাদৃশ্য বহিঃশক্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। নাম শোনা গিয়েছিল পাম্মা এবং রোডের। যারা হিংস্র খালিস্তানি সন্ত্রাসী। তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় জার্মানি ও কানাডা থেকে। তাছাড়াও রয়েছে জার্মানির গুরমিত সিংহ বাগ্গা এবং নিষিদ্ধ হওয়া খালিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের ভূপেন্দর সিংহ বিন্দা। আরও চমকে যাওয়ার বিষয়, খালিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের প্রধান রজনীত সিংহ নীতা এবং খালিস্তান কমান্ডো ফোর্সের চিফ পরমজিৎ সিংহ পাঞ্জওয়ার লাহোরের মদতে লালিত পালিত। ওরা ওখান থেকেই কার্যকলাপ পরিচালনা করে।

গত এক দশক ধরে, ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স লক্ষ্য করছে খালিস্তানি আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তানের 'আইএসআই' (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলিজেন্স)-এর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। যারা দুষ্টচক্র পরিচালিত করে ভারতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাশক্তির মদত দেয়। পাকিস্তানের 'কে-২' প্ল্যানেই (কাশ্মীর, খালিস্তান) ১৯৮০-তে খালিস্তানিরা ঘৃণ্য তাণ্ডব চালিয়েছিল এই মাটিতে।

২০২১-এর ৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। পঞ্জাব পুলিশের একটি অতি সক্রিয় টিম লক্ষ্ণৌতে জগরূপ সিংহ নামক গ্যাংস্টারকে গ্রেপ্তার করলে তার থেকে চীনা পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। তার আরও এক দোসর গুরপিন্দর সিংহ পুলিশের জালে ধরা পড়লে জানা যায় তারা খালিস্তান টাইগার ফোর্সের সেনা। যারা ইংল্যান্ডের বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনের নির্দেশক পরমজিৎ সিংহ পাম্মার নির্দেশানুসারে ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল।

১৯৮০-৯০-এর মধ্যে লাহোরের শিখ ইউথ ফেডারেশনের নির্দেশে খালিস্তানের দাবিতে এতটাই আগ্রাসী হয় জঙ্গিরা যে ২০ জন স্বয়ংসেবকে হত্যা পর্যন্ত করে। আজকের দিনে এ এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের কথা নয়। ২০২০ সালেই ওটাওয়ার ম্যাকডনাল্ড লরিয়ার ইন্সটিটিউটের বর্ষীয়ান সাংবাদিক টেরি মাইলস্কি তাঁর 'খালিস্তান : এ প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' শীর্ষক প্রকাশনায় স্পষ্ট উল্লেখ করেন পাকিস্তানি দাওয়াইতে চলা এই মুভমেন্ট ভারত ও কানাডার জন্য অত্যন্ত আশঙ্কার।

২০১৯ থেকে পঞ্জাব প্রদেশ এবং কাশ্মীর সীমান্তে ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ড্রোন মারফত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করছে খালিস্তানি গতিবিধি এবং মাদক পাচার রোধে। যখন এ দেশে কৃষি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনজীবীরা গর্জন করছে, তার পিছনের শক্তিও ছিল খালিস্তানি। এও আমাদের কথা নয়। কংগ্রেস সাংসদ রভনীত সিংহ বিট্টু (লুধিয়ানা) স্বয়ং একথা বলেছেন। তাই খালিস্তানি আন্দোলনের আড়ালে তা যে কতবড়ো সন্ত্রাস চক্রান্ত তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

খালিস্তানি সন্ত্রাস নানান রূপে কার্যকরী। তাইতো নিবন্ধের শুরুতেই রাক্ষসকুলের উদাহরণ রেখেছি। যারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে দুষ্টকার্য সম্পন্ন করে। কানাডায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কানাডা বেসড পোয়েটিক জাস্টিস ফাউন্ডেশন। যারা বিশ্বব্যাপী খালিস্তান আন্দোলনের নেটওয়ার্ক বিভিন্ন কৌশলে বৃদ্ধি করছে। শিখ ফর জাস্টিস তৈরি হলো কবে? ২০০৭-এ। পাননু নামে এক অভিবাসী ট্যাক্সি চালক যে নিজেকে ১৯৮৪ শিখ রায়টের ভুক্তভোগী বলে পরিচিত করে। যে ক্যালিফোর্নিয়াতে তরুণদের সন্ত্রাসী পথের শিক্ষায় উসকানি দিত। এই পাননুই দিল্লির কৃষি বিল বিক্ষোভের সময় ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লা আক্রমণের ফাঁদ তৈরি করছিল।

খালিস্তান সন্ত্রাস যে কী জঘন্য এবং উগ্রতার আরও বড়ো প্রমাণ, ২০১৮-তে ব্রিটিশ পাকিস্তানি রাজনীতিক নাজির আহমেদ মুক্ত মঞ্চে ঘোষণা করলেন পৃথক খালিস্তান প্রদেশ ভারতের থেকে তৈরি হোক। এবং এই জঙ্গি কার্যকলাপে যে পাকিস্তান অর্থ ও সাজসরঞ্জাম যোগে সাহায্য করছে তাও স্পষ্ট হয় তার বক্তব্য।

২০২০-তেও পাকিস্তানের আইএসআই-এর ওয়েবসাইটে খালিস্তান আন্দোলনের ক্যাম্পেইন দেখা যায়' A campaign to liberate Pubjab, Currently occupied by India'। সামাজিক মাধ্যম বিশেষজ্ঞমহল নিশ্চিত করেছেন খালিস্তান আন্দোলন সামাজিক মাধ্যমেও ফল্গুধারার মতো বহমান। টাকা দিচ্ছে আইএআই। অরজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞদের মতে ২০১৮-র পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমকে বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে খালিস্তান মুভমেন্ট। লক্ষণীয়,২০১৮-র নভেম্বরেই ভারত-পাক কাতারপুর করিডোরের কাজ সম্পন্ন হয়। এবং তারপর থেকে আরও সক্রিয় হয় খালিস্তানি জঙ্গি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। পাকিস্তান মুখে বলে বটে যে ২০১৯-এর পর থেকে তারা রেফারেন্ডান ২০২০ সংযোগী সব কার্যকলাপ বন্ধ করেছে কিন্তু খালিস্তানি সামাজিক মাধ্যম বলছে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে ও মদতে চলছে। আশ্চর্য এটাই, কাতারপুর করিডোরের কাজ হওয়ার আগে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় খালিস্তানিদের ট্যুইট ছিল ১৬১টি (নভেম্বর ২০১৮) তা একমাসে লাফিয়ে হলো ১,১৮১ ! একই ভাবে ইউটিউব প্রোপাগান্ডা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৮ থেকে একমাসে ১৩৭৪-এ।

২০২২-এর ২৬ জানুয়ারিতে খালিস্তানিরা বিশ্বের সর্বত্র ভারতের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার লক্ষ্যে ছিল। এবং ওই ঘটনার পরেই হাডসন ইন্সটিটিউট রিপোর্টে জানায়, পাকিস্তানের অর্থে চলছে এই সন্ত্রাস। ১০ জানুয়ারি, আমেরিকার বুকে খালিস্তানি শিখ ফর জাস্টিস ঘোষণা করল, 'রাইসে কেশরী খালিস্তান'-এর জন্য তারা ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে। একই সঙ্গে ঘোষণা ছিল মোদীর ত্রিরঙ্গা ক্যাম্পেইন যে করেই হোক লণ্ডভণ্ড করতে হবে।

যদি আবার একবছর আগের (২০২১) ২৩ ডিসেম্বরে ফিরে যাই তাহলে দেখা যাবে, লুধিয়ানা জেলা আদালত বোমা বিস্ফোরণের হোতা ছিল জার্মানির যশেন্দর সিংহ মূলতানি। যে খালিস্তানি আন্দোলনজীবী। এবং এনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 'Has linked to Pakistan and has been involved in smuggling of arms and ammunition from across border into Punjab'। একই সময় যখন হাউসটন ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট প্রকাশ পেল 'Pakistan's Destabilization Playbook : Khalistan Separatism within the US' যা বারবার খালিস্তানি সন্ত্রাস দমনে উৎকণ্ঠিত। যা নিয়ে পশ্চিমি দেশগুলিও সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। কারণ আন্তর্জাতিক মহল আজকেও ভোলেনি ১৯৮৫ খালিস্তানি সন্ত্রাসে এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৮২ যা মন্ট্রিল থেকে লন্ডনে উড়ছিল। ৩২৯ জন যাত্রীর হত্যা করেছিল ওই খালিস্তানিরা বোমা বিস্ফোরণে। চেষ্টায় ছিল একই দিনে এয়ার ইন্ডিয়া টোকিয়োগামী বিমান হানারও। তাই খালিস্তান আন্দোলন একটা অমানবিক পৈশাচিক বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘৃণ্য দুষ্কর্ম। যার অনুঘটক পাকিস্তানের জঙ্গিমহল। □

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা-সহ দেশের সকল গণহত্যার তদন্ত হওয়া জরুরি

তদন্তের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা হোক হত্যাকারী এবং তাদের সহযোগীদের মুখগুলো

মণীন্দ্রনাথ সাহা

শুরু হতে চলেছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যার তদন্ত। জানা গেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)-র কাছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক নীলকান্ত গাঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের মামলা ফের চালু করার আবেদন জানানো হয়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট আবেদনের ভিত্তিতে কাশ্মীরি পণ্ডিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তথ্য জানা ব্যক্তিদের এই তদন্তের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে এসআইএ। এজেন্সি এই মামলায় সাহায্যকারীদের নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের টার্গেট কিলিং অভিযানের অংশ হিসেবেই ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর শ্রীনগরে হাইকোর্টের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয় বিচারক নীলকান্ত গাঞ্জুকে। তিনি ওইসময় দায়রা এবং জেলা আদালতের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন। আসলে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা বিচ্ছিন্নতাবাদী মকবুল ভাটের বিচার করায় জঙ্গিদের নিশানায় চলে আসেন তিনি। ১৯৬৮ সালে গাঞ্জু পুলিশ ইন্সপেক্টর অমরচাঁদ হত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে ভাটকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরে শীর্ষ আদালতে মামলাটি গেলেও ১৯৮২ সালে একই রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৮৪ সালে ভাটের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। আসলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভয় দেখাতেই গাঞ্জুকে খুন করা হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করলেও ফারুক আব্দুল্লা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন কাশ্মীরকে কাশ্মীরি পণ্ডিত মুক্ত করতে।

মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লার কার্যধারা কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দেয়। যেমন— তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতা থেকে জানা গেছে— ১৯৮৯ সালে ফারুক আব্দুল্লা কাশ্মীরের কারাগার থেকে ৭০ জন হিজবুল মুজাহিদ্দিন জঙ্গিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৯০ সালের ৪ জানুয়ারি 'আফতাব' নামে উর্দু সংবাদপত্রে হিজবুল মুজাহিদ্দিন বিবৃতি দিয়ে বলে— 'সমস্ত হিন্দু পণ্ডিতকে অবিলম্বে কাশ্মীর ছাড়তে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লা

চুপ ছিলেন। হিজবুল মুজাহিদ্দিন আরও বলেছিল— 'হিন্দু পণ্ডিতরা তাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের কাশ্মীরে রেখে চলে যাক।'

১৯৯০-এর ১৯ জুন কাশ্মীরের সবকটি মসজিদ থেকে মাইকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল— 'অবিলম্বে হিন্দু পণ্ডিতরা কাশ্মীর ছাড়ো। কাফেরদের কাশ্মীরে কোনও জায়গা নেই।' তবুও ফারুক আব্দুল্লা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেননি। ওইদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী টিকালাল টাপলো, আইনজীবী প্রেমনাথ ভাট, অধ্যাপক বিকে গাঞ্জুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কাশ্মীরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন সর্বানন্দ কাউল। তিনি রোজ কপালে তিলক পরতেন। কপালে তিলকের জায়গায় পেরেক ঠুকে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর নগ্ন দেহ রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল ভীতি সঞ্চার করতে। স্কুল শিক্ষিকা গিরিজা টিক্কুকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বহু হিন্দু রমণীকে অপহরণ করে তাদের যৌনাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল বলে সংবাদে প্রকাশ হয়েছিল পরে।

এরপরেও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বারবার গণহত্যার শিকার হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ৭ জন পণ্ডিতকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে শিশু ও বৃদ্ধ-সহ ২৩ জন পণ্ডিতকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সরকারি মতে দু' লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত পালিয়ে এসে দিল্লি এবং আশপাশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বেসরকারি মতে চার লক্ষের ওপর ছিল সেই সংখ্যা।

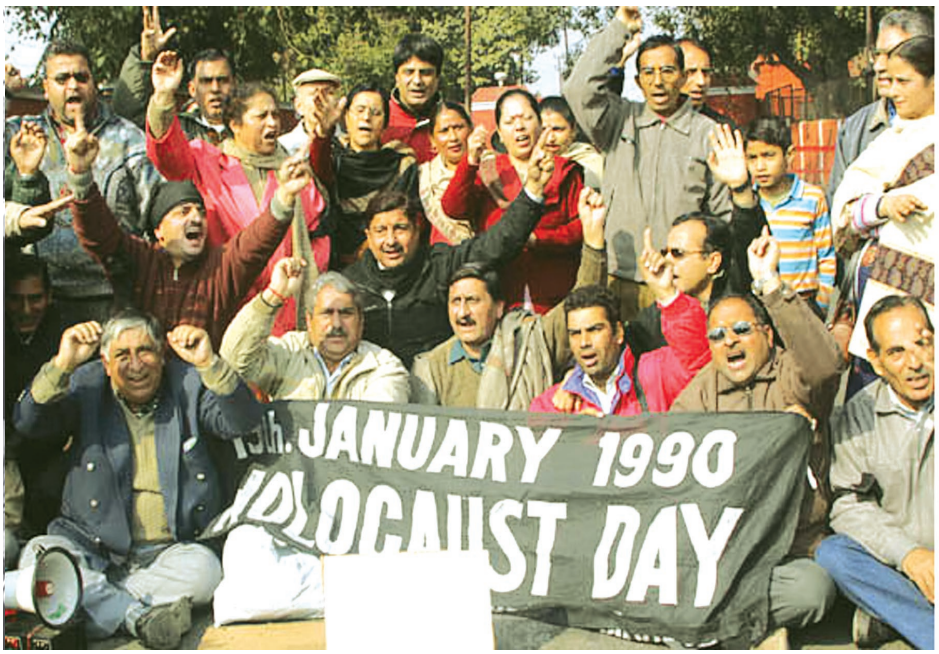

শুধু কাশ্মীরে যে হিন্দুগণহত্যা হয়েছে তা কিন্তু নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত গণহত্যা হয়েছে, সমস্ত গণহত্যার তদন্ত করা হোক। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ যেখানে যেখানে গণহত্যা হয়েছে। তদন্ত হোক পশ্চিমবঙ্গের সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, কাশীপুর, বরানগর, বানতলা, ধর্মতলা ২১ জুলাই, সূচপুর, ছোটো আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম, নলিয়াখালি, নদীয়া এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে-পরের গণহত্যার। এছাড়াও তদন্ত হোক ১৯৮৪ সালের শিখ গণহত্যারও। আরও তদন্ত হোক আর এক কর্মদক্ষ প্রাধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুরও। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই কেন বিষ পান করিয়ে শাস্ত্রীজীকে মারা হলো? সেই তদন্তে যেন উঠে আসে তাসখন্দে ভারতের কূটনীতিকের বাসভবনের পাচক জান মহম্মদকে শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পরেরদিন থেকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরে জানা গেল তিনি পাকিস্তানে চলে গেছেন। সেই পাকিস্তানে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ভারত সরকারের তরফ থেকে তার পেনশন প্রদান করা হয়েছে কেন এবং কার নির্দেশে?

তদন্ত হোক দীনদয়াল উপাধ্যায়ের হত্যার। আরও তদন্ত হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হত্যাকাণ্ডের। কার নির্দেশে তাকে কাশ্মীরে হত্যা করা হয়েছিল? শাস্ত্রীজীর হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হওয়ার ভুতুড়ে গল্প, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরে প্রাসাদের মতো বাড়িতে আদর যত্নে রাখা এবং নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার মতোই আষাঢ়ে গল্প। নেতাজীর অন্তর্ধান এবং শ্যামাপ্রসাদ ও শাস্ত্রীজীর মৃত্যু নিয়ে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এদিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বোস, মুখার্জী ও শাস্ত্রী পরিবার নেহরু-ফিরোজ পরিবারের দেওয়া ব্যাখ্যা মানতে পারেননি।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী যেন উল্লেখিত ঘটনাগুলোর তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের উন্মোচন করে দেশবাসীকে প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ করে দেন। অনেকেই মনে করেন বিদেশিদের চাপে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা ভারত এখন আর কংগ্রেস শাসিত ভারত নয়। এ ভারত মোদী শাসিত নতুন ভারত। যে সমস্ত দেশ কংগ্রেস শাসনকালে ভারতকে চোখ রাঙিয়েছে। তাদেরকেই এখন ভারত উঠবোস করাচ্ছে। ওই সমস্ত দেশগুলোই এখন ভারতের কৃপাপ্রার্থী। কাজেই এই সুযোগে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করলে কোনো দেশই ভারতকে ভয় দেখাতে পারবে না।

আর নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন হলে একাধারে দেশবাসী যেমন প্রকৃত সত্য জেনে শান্তি পাবেন, তেমনি যারা এই রহস্যকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তাদের চেহারাও দেশবাসী ভালো করে চিনে রাখবেন। এছাড়া দেশের নিরীহ জনসাধারণের হত্যার নায়করা যেন তাদের সংগঠিত অপরাধের শাস্তি পায়। তদন্তের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা হোক হত্যাকারী এবং তাদের সহযোগীদের মুখগুলো। □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার দায় কি এড়াতে পারেন শিক্ষামন্ত্রী?

বিশ্বপ্রিয় দাস

২০১৬ সালেও ঘটেছিল এমন এক ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ঝুলন্ত দেহ মিলেছিল সৌমিত্র দে-র। বাবা-মায়ের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে নিজের একরাশ ইচ্ছা নিয়ে কলকাতায় এসেছিল ছোট্ট সৌমিত্র। বাঁকুড়ার সেই ছোট্ট ছেলেটির পরিবার একেবারেই নিম্ন বিত্তের তালিকায়। কৃষক পরিবারের ছেলেটি খুব মেধাবী হওয়ায়, কলকাতার যাদবপুরের ফাইভ স্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়েছিল দর্শন নিয়ে পড়ার জন্য।

দিনটা ছিল ৪ ডিসেম্বর। বাড়ির মানুষের কাছ থেকে চিরতরে দূর দেশের যাত্রী হয়ে ধরাছোঁয়ার একেবারেই বাইরে চলে গেল সৌমিত্র। হোস্টেলে সিলিং ফ্যানে গলায় গামছা দিয়ে নিজেকে শেষ করেছে সে। আজও তাঁর পরিবার ছেলের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের শাস্তি চেয়ে সুবিচারের আশায় ঘুরছেন দুয়ারে দুয়ারে।

কদিন আগে স্বপ্নদীপ চলে গেল। সারা গায়ে অনেক ক্ষত। তাঁর থেকেও সে এই শিক্ষাব্যবস্থায় কত যে ক্ষত নিয়ে তারা পড়াশোনা করতে আসে, সেটাও পরিষ্কার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

এখানেও যারা দোষী, তাদের একটা আন্দাজ করে ধরাও হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কাউকে কি আড়াল করার চেষ্টা চলছে? কী এমন ঘটনা সেদিন ঘটেছিল, যেটা স্বপ্নদীপের মানসিক শক্তিকে একেবারেই ভেঙে দিয়েছিল? সে সব প্রশ্ন ইতিমধ্যেই নানা সংবাদমাধ্যমে উঠেছে।

দক্ষিণ কলকাতায় কুলীন বিশ্ববিদ্যালয় এই যাদবপুর। অনেকে বলেন বাম রাজনীতির হাতে খড়ি নাকি হয় এখানে। কেউ আবার বলেন, এখানে নাকি রাজনীতির থেকে আসা একদল বড়ো হোতা আছেন, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মাদকের একটি মুক্ত সেবনকেন্দ্র হিসেবে পরিচয়ে। এটি আবার মাদকের একটি পরিচিত বিক্রয়কেন্দ্র বটে। যেটা রোখার ক্ষমতা আজও হয়ে ওঠেনি প্রশাসনিক স্তরে থাকা কর্তাব্যক্তিদের। এই মাদকের টানে এখানে বহিরাগতদের আনাগোনা নিয়মিত থাকে। পাশেই রেল লাইন। ফলে ড্রাগ পেডলাররাও এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে ঘাঁটি হিসেবে। প্রশাসন কি জানে না এসব? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী থেকে অধ্যাপকরা এই বিষয়ে একেবারেই মুখ খুলতে চান না। কথা আসে ক্যাম্পাস জুড়ে লাগানো সিসি টিভি ক্যামেরার বিষয়। অনেকে মনে করেন, এই মাদক ও নানারকম অসামাজিক কাজকর্মের জন্য এখানে সিসি ক্যামেরাকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে, নয়তো মাদকাসক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা লাগাতেই দেয়নি। ফলে কোনও ঘটনা ঘটলে, সেটার প্রমাণ পাওয়াও কঠিন।

রাজনৈতিক ভাবে একটা অন্য ধারা চলে এই যাদবপুরে। নানারকম প্রলোভন ও ড্রাগ দিয়ে বামপন্থী কর্মী তৈরি করার সবতিকাগার এই বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অনেক চেষ্টা করেও এই রাজনৈতিক চক্রব্যূহকে ভাঙতে পারেনি। তারাও যে একটা বলয় তৈরি করেনি তা নয়, তারাও এই মাদকাসক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মন জুগিয়ে চলে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণও করে। ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের বয়েসের কৌতূহলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। আবার এখানে কিছু দাদা শ্রেণীর প্রাক্তন পড়ুয়া আছেন, যারা আবার কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নিজেকে রেখে এই ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে নিজেদের মতকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় স্রোতে ভাসাতে বাধ্য হয় পড়ুয়ারা। আর ফায়দা লোটে রাজনীতির নোংরা ব্যাপারিরা। নোংরা রাজনীতির চাপে, স্বার্থান্বেষী ছাত্রদের নানা আন্দোলনে চাপে থাকেন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। তাঁদের ওপর চাপ থাকে রাজনীতির ওপরতলা থেকেও। এই রকম ঘটনার সাক্ষী বারে বারে হয়েছে সবাই। যেমন আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল ঢুকতে পারেননি, তেমনি সেই সময়ের একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও ঢুকতে পারেননি একজন সাংসদ। শাসক দলের সেই সময়ে অবস্থান কী ছিল, সেটা কারোর অজানা নয়।

কেন যাদবপুর বারে বারে সংবাদ শিরোনামে স্থান পায়? যদি র‍্যাগিঙের কথা ধরা হয়, তাহলে নগ্ন হয়ে ঘুরতে বলা, বাবা-মায়ের যৌন জীবন নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, প্রাক্তন-কাম সিনিয়রদের ফাইফরমাশ খাটা, এছাড়াও কথা না শুনলে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, হোস্টেলের বাইরে বের করে দেওয়া-সহ নানা মানসিক অত্যাচার চলে। একথা ইতিমধ্যেই নানা সংবাদমাধ্যমে বলেছেন যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা। অথচ র‍্যাগিং নিয়ন্ত্রণে আছে কঠোর আইন, সেটা যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে প্রযোজ্য, তেমনি সরকারি ক্ষেত্রেও। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদনেও আঘাত আসতে পারে এই র‍্যাগিং আইনের অমান্যের কারণে যদি প্রমাণিত হয়। তাহলে দিনের পর দিন এই ঘটনা একটি সরকারি ক্ষেত্রে ঘটে চলা, কী করে প্রশাসনিক নজর এড়িয়ে যায়? কেন ক্যাম্পাসে পুলিশ দিয়ে এই অপরাধ থামানোর কড়া ব্যবস্থা নেয়নি বা নিতে চেষ্টা করেনি প্রশাসন? কেনই-বা যাদবপুরের নাম ঘটনা নিয়মিত ঘটলেও চোখ এড়িয়ে যায় প্রশাসনের। বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক নিশ্চয়ই নিজস্ব প্রশাসন। বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে। কিন্তু অপরাধ মূলক কার্যকলাপ রোধ করার জন্য কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য নেন না? কেনই-বা স্থানীয় প্রশাসন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ দমন করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে এগিয়ে আসে না, সেটাও প্রশ্ন হয়ে চলে আসছে সমানে।

একটা স্বপ্নদীপ বা একটা সোমিত্র চলে যাওয়া নয়। যেটা এই মৃত্যুগুলি প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটি ছবি প্রকাশ করে দিল, তাঁর দায় কি বর্তমান রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? অবশ্য চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী দায় ঠেলে দিয়েছে রাজ্যপালের ঘাড়ে। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন, অতীতে এক আচার্য যখন প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কিছু পদক্ষেপের কথা বলেছিলেন, বা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময়ে রাজ্যের শাসক দলের অবস্থান কী ছিল? মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, এই ঘটনা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। আচার্য ছাড়াই সেদিন সমাবর্তন হয়েছিল। সেদিন তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্যরা গেটেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। উপাচার্যকে ফোন করে জানান, তিনি গেটেই আটকে আছেন। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি রাজভবনে ফিরে যান। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকেও জানান তাঁর হেনস্থার কথা। এবার শিক্ষামন্ত্রী কী বলবেন, যেখানে রাজনীতির নোংরা খেলায় আপনারা কলুষিত করেছিলেন। তাঁর দায় কী এড়াতে পারবেন? আজ আপনি যেমন এই ঘটনার দায় এড়িয়ে একটা পলায়ন নীতি অবলম্বন করতে চাইছেন, দায় চাপাচ্ছেন আচার্য রাজ্যপালের ঘাড়ে। ওহ্! আপনার মনের মানুষ, দলের সুপ্রিমো, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে দেখার যে স্বপ্ন আপনি মনের মধ্যে লালনপালন করছেন কিন্তু বাস্তবায়িত করতে পারছেন না, তাঁর একটা চাপা হতাশা তো আপনার মনে থাকা স্বাভাবিক। আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে অন্যান্য প্রসাসনিক প্রধান, এমনকী কর্মচারীরাও আপনার দলের অঙ্গুলি হেলনে নড়াচড়া করেন। তাঁরা কি দায় এড়াতে পারেন? আপনি সেই সূত্র ধরে এই নাবালক ছাত্রের মৃত্যুর দায় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন? ওহ্, হ্যাঁ, এরা তো কেউ আপনার দলের বা আপনার পরিবারের কেউ নয়। □

১৫ আগস্ট নয়, ১৮ আগস্ট মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার স্বাধীনতা দিবস

দৃশ্য-১ : একদিকে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কলমের আঁচড়ে ভারতবর্ষের চূড়ান্ত ভাগাভাগি চলছে, অপরদিকে চলছে অন্য ভাগাভাগির হিসেব। হিংস্র শ্বাপদদের হিন্দু নারী মাংসের ভাগাভাগির হিসেবে। কয়েক রাত নওদার আব্দুল, মতীন, খয়রুল চাচাদের চোখে ঘুম নেই। একই অবস্থা দৌলতাবাদের বদরুদ্দিন, চক ইসলামপুরের জিয়ারুল, নওদার কাজেম শেখদের (নামগুলি কাল্পনিক)। লিগ মাধ্যমে তাদের কাছে পাক্কা খবর ছিল যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া পাকিস্তানে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে গনিমতের বখরার ভাগবাঁটোয়ারা এখনই সেরে নিতে হবে যে! বস্তুত, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের শিকারপুর-কাতলামারি থেকে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত পরিস্থিতি একই ছিল। দৌলতাবাদের নওদাপাড়া গ্রামের প্রয়াত আমিনা বেওয়া কিছুদিন আগেও বলে বেড়াতেন, 'সেই সব দিনের' গল্প। ভৈরবের পশ্চিম পাড়ের নওদাপাড়ায় তখন মুসলমানদের বাস। পুবপাড়ে চক-ইসলামপুরে আবার সব হিন্দু। আমিনার মনে পড়ত, 'ওই কয়েকদিন' চক ইসলামপুরের মানুষ আতঙ্কে ঘরের দরজা খোলেননি। পাকিস্তানপন্থী মুসলমান যুবকরা কাঁধে লাঠি টানিয়ে সুর করে 'হাতে লাঠি, মুখে পান, লাঠির ডগায় পাকিস্তান' গেয়ে সেখানকার বিভিন্ন বাড়িতে ট্যাঁড়া আঁকত দখল করার জন্য। 'ট্যাঁড়া' মানে কোন হিন্দু বাড়ির কোন মেয়ে বউটা, কার বাড়ির কটা গোরু ছাগল কোন আব্দুলদের ভাগে যাবে তার টোকেন। গনিমতের বখরায় পাপ নেই যে। রঘুনাথগঞ্জের এক প্রবীণ ব্যক্তির মুখে শুনেছিলাম যে হিন্দু জমিদার গিন্নি কার ভাগে যাবে এই দিয়ে দুই বাপ ব্যাটা আকবর আর জাহাঙ্গিরের মধ্যে লাঠালাঠি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

দৃশ্য-২ : ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট মধ্যরাত ঘড়ির কাঁটা ১২টা স্পর্শ করা মাত্র বেজে উঠল ঘণ্টা। ইউনিয়ন জ্যাককে নামিয়ে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে কাব্যিক কেতায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করলেন, 'মধ্যরাত্রির ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যখন নিদ্রিত, ভারত তখন জেগে উঠল স্বাধীনতা ও নবজীবন লাভ করে। এমন একটি মুহূর্ত এল, যা ইতিহাসে দুর্লভ, যখন অবসান হলো একটি যুগের, আমরা পুরনোকে ত্যাগ করে নতুনকে বরণ করে নিলাম এবং যখন দীর্ঘদিন অবদমিত একটি জাতির মুখে কথা ফুটল।' কাব্যিক সুষমামন্ডিত বক্তব্যে স্বাধীনতার মুহূর্তটিকে নেহরুজী অভিনন্দিত করলেও তার কয়েক ঘণ্টা আগেই ঘটে গেছে এক মারাত্মক ভয়াবহ ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। দেশভাগের দগদগে ক্ষতকে সাক্ষী রেখে ভারতমাতাকে টুকরো করে জন্ম হয়েছে ইসলামিক দেশ পাকিস্তানের। তাই ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে আনন্দের পরিবেশ থাকলেও সীমান্ত অঞ্চলে আবার অন্যরকম পরিস্থিতি। স্বাধীনতার আনন্দ ছাপিয়ে হিন্দুদের মধ্যে সর্বত্র ভয় আর সন্ত্রাসের পরিবেশ। ভীতসন্ত্রস্ত ছিন্নমূল হিন্দুরা দলে দলে এক কাপড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে এপারবঙ্গে চলে আসছে। ইসলামিক মুসলিম লিগের হিন্দু নিধনকারী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কোন অঞ্চল ভারতে থাকল, কোন অঞ্চল পাকিস্তানে গেল এই নিয়ে তখন সর্বত্রই বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে চাপা উত্তেজনার ফিসফিসানি। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার হাল তখন খুবই খারাপ। ১৬ আগস্ট জানা গেল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছে। মনিরুল, জিয়াউলদের আনন্দ এবার দেখে কে। মনিরুল কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে গোরু চরানোর কাজ করত। মহারানির প্রতি তার বিশেষ লোভ ছিল। আব্দুলরা লুঠের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। নদীয়ার রাজপরিবার থেকে সুরক্ষার জন্যে ব্রিটিশদের কাছে অনুরোধ গেল, শুরু হলো মিছিল, মিটিং প্রতিবাদ।

দৃশ্য-৩ : 'পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে'— 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বুলি কপচানো অবিভক্ত কমিউনিস্টদের এক নেতা সুধীন সেন। বহরমপুরের স্কোয়ার ফিল্ডে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের পর মহানন্দে গান ধরলেন, 'সোনার দেশে গড়ব মোরা স্বাধীন পাকিস্তান, সুখ-শান্তি আনব মিলে হিন্দু-মুসলমান।' যদিও পাকিস্তানপন্থীদের এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মুর্শিদাবাদ, নদীয়াকে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত করবার প্রচেষ্টা শুরু হলো। এ ব্যাপারে মূলত জনসঙ্ঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াজেদ আলি মির্জা-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। নদীকেন্দ্রিক বিভাজনের বাস্তবতা এবং কলকাতা বন্দরকে ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে বাঁচাবার তাগিদে অবশেষে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ভারত ভুক্ত হলো।

দৃশ্য-৪ : ১৮ আগস্ট বেতারে এই খবর ঘোষিত হলো। জানা গেল মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার বিনিময়ে খুলনা-সহ কিছু অংশ পাকিস্তান ভুক্ত হয়েছে। আবার নতুন করে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হলো। তিনদিন আগেই যেখানে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল, সেখানে উড়ল তেরঙ্গা। নদীয়ার শিব নিবাস, রানাঘাট, শান্তিপুরে আজও শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাইচ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আজও ১৮ আগস্ট বিশেষ ভাবে পালিত হয়।

দৃশ্য-৫ : মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির খবর চাউর হতেই ট্যাঁড়া পার্টিরা এলাকা ছেড়ে পগারপার। বলির পাঁঠার মতো ভীত হিন্দুরা বীরদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আকবর চাচাকে ছেলে-সহ কুয়োপাড়ে বাঁধা হলো। তার লম্বা দাড়ি ক্ষিপ্ত জনতা যে যতটা পারল উপড়ে নিল।

মুর্শিদাবাদের স্কোয়ারফিল্ডে এবার ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো— মুর্শিদাবাদ, নদীয়াবাসী স্বাধীনতা পেল ১৮ আগস্ট। তাই ১৫ আগস্ট নয়, ১৮ আগস্টই মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার স্বাধীনতা দিবস। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া 'বেঁচে' গেল বটে, একবার ভাবুন খুলনা-সহ বাকি পূর্ব পাকিস্তানে

ফঃ ৩

এরপর হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষত মা-বোনেদের সঙ্গে কী ঘটেছিল!

—মন্দার গোস্বামী,
২৩, ঈশ্বরবাবুর গলি, খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ।

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৫ আগস্ট বিশেষ সংখ্যায় স্বস্তিকা পত্রিকায় অধ্যাপক ড. স্বাগত বসুর লেখা—'ঋষি অরবিন্দের বিপ্লব সাধনা' প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। এই লেখা থেকে ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পেরেছি। এই লেখার মধ্যে একটি অনুচ্ছেদে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে 'বরোদার সেনাবাহিনীতে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সামারিক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর দেশের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান করে তাদের নিয়ে একটি সাময়িক বাহিনী তৈরি করবেন আর এখানেই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়।'

আমার যতদূর মনে হয়, এই যতীন্দ্রনাথ আলাদা। তিনি হলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে। যিনি বরোদার রাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। অস্ত্র চালনা, ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষক, এমনকী রাজার দেহরক্ষী ছিলেন। সেই সময় রাজাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আহত হন। বরোদার রাজার কথামতো যতীন্দ্রনাথকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব পড়ে অরবিন্দের উপর। আর সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগদান করেন অরবিন্দ ঘোষ। পরে অরবিন্দ ঘোষ বাঙ্গলার বুকে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলায় আসার আহ্বান জানান। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙ্গলার পবিত্র ভূমিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে আরও সুদৃঢ় করতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে নিজগ্রাম চান্না এবং পরে চন্দননগরে যান। চন্দননগরে সুহৃদ সম্মিলনী কক্ষে এই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যুবক রাসবিহারী বসু বিপ্লবের পথে পা রাখেন। ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাই বারীণ ঘোষকে কলকাতায় বাগবাজারে পাঠান। সেখানে প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়।

এরপর এক পবিত্র দোল পূর্ণিমার দিন পি মিত্রের নেতৃত্বে বরোদা থেকে আসা যুবক এবং বাঙ্গলার বীর বিপ্লবীদের নিয়ে একটি বিপ্লবীর নীড় গঠিত হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'ইস্ট ক্লাব'। পরে এই সংগঠনের নাম অনুশীলন সমিতি রাখা হয়। যার সভাপতি ছিলেন পি মিত্র, সহ-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ। সমিতির কোষাধ্যক্ষ রূপে সুরেন ঠাকুর দায়িত্ব নেন। যুবক বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা প্রদান, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত করার দায়িত্ব পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। পরে তিনি নিরালম্ব স্বামী নামে খ্যাতিলাভ করেন। এই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'অগ্নিযুগের ব্রহ্মা' নামে আখ্যায়িত করেন। সম্ভবত, লেখকের মুখোপাধ্যায়—বন্দ্যোপাধ্যায় গুলিয়ে গেছে।

—সৃজন কুমার হাজরা,
চাঁদনীপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিনকে বিএমএস জাতীয় শ্রমিক দিবস মনে করে

দেশের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ শুরু থেকেই বিশ্বকর্মা পুজোর দিনকে জাতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে চলেছে। তাদের শ্রমিক গীত হলো, 'জনসেবা যে কর্ম আমাদের—ধর্ম আমাদের মানবতা। শোষিত পীড়িত মানুষের ভাগ্য গড়বো মোরা দিলাম কথা।' এই ভাবেই এরা কোনো সংগঠন না ভেঙে আজ দেশের এক নম্বর শ্রমিক সংগঠন। যারা উচ্চ কণ্ঠে স্লোগান দেন, 'দেশকে হিতমে করেঙ্গে কাম, কামকে লেঙ্গে পুরে দাম'। যার অর্থ হলো, দেশের ভালোর জন্য কাজ করবো, কাজের পুরো দাম নেব। পাই পয়সার হিসেবে বুঝে নেব। শ্রমিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে এই সংগঠন আজ এতো বড়ো হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ভালো করেই বিএমএসকে জানেন। বিশ্বকর্মা জয়ন্তীকে পেশাগত শ্রমিকরাও পালন করেন। যেমন স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের ও সাইকেল-মোটর সাইকেল মিস্ত্রিরাও ভক্তিভরে এই দিনটি উদ্‌যাপন করেন। এর আগের কোনো সরকার এদের জন্য ভাবেননি।

এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার এই সব পেশাগত শ্রমিকদের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থের সংস্থার করেছেন। গত ১৫ আগস্ট দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী এই সব পেশাগত শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিশ্বকর্মা যোজনার কথা ঘোষণা করেন। পরে তিনি তার ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভার মিটিঙে ১৪ হাজার কোটি টাকার মতো প্রাথমিক ভাবে অর্থ বরাদ্দ করেন। এতে তিন লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে বিশ্বকর্মা যোজনা ঘোষণা করায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ বেজায় খুশি। তবে দুঃখের বিষয় এ রাজ্যের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কেউই ভালো করে এই প্রকল্পের উল্লেখ করেনি এবং প্রচার থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। যাইহোক, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৭ বছরে এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী এই গরিব প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে দেশ নিশ্চিত শক্তিশালী হবে।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় মায়েদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

দীর্ঘদিন ধরে উত্তর মুম্বাইতে বরাটপাদা নামক এক জনজাতি গ্রামে লেবুগাছে লেবু হতো না, ফুল আসত তারপর তা ঝরে যেত। বর্তমানে ওইসব গাছগুলো লেবুতে ভরে গেছে এবং এর কৃতিত্ব হলো মৌমাছি এবং সেখানকার মহিলাদের।

সমগ্র বিশ্বের মতো মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার গ্রামগুলিও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব নেতিবাচক হয়। একদিকে অসময়ে বৃষ্টিপাত, অন্যদিকে ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ওয়ারলি বনবাসী ক্ষেত্রের প্রায় ১১৩টি গ্রামের ১৫০০-এরও বেশি সংখ্যক গ্রামবাসী, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা, তাদের নিজস্ব মৌমাছি পালনের বাক্স আছে। ওই বাক্সগুলি তাদের পরিবারে এনে দিয়েছে সুস্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা। ৩০০০টি গ্রামে মৌমাছি পালন চলছে।

মাথায় হেলমেটের মতো জালি দেওয়া টুপি এবং হাতে দস্তানা পরতে পরতে জারি গ্রামের গাঙ্গু রাওটে জানান যে, এখন তাদের সন্তান এবং পরিবারের সদস্যরা মধু পছন্দ করেন। মধু বিক্রি করে ও পুষ্টি বাগানের মাধ্যমে খাদ্যাভাসেও উন্নতি হয়েছে। রাওটে বলেন সে আগে মৌমাছি থেকে ভয় পেত, পরে সে মৌমাছি বাক্স ধরা শিখেছে এবং এখন সে অন্যদের মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষকরূপেও তার উপার্জন হয়ে থাকে।

এই পরিবর্তন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে শুরু হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে। বিজয়া পাসতালা নামে মুম্বাইয়ের একজন মহিলা যিনি গ্রামবাসীদের উপার্জনের বিষয়ে সচেতন করেন, তিনি 'আম গাছের নীচের সোসাইটি নামে একটি এনজিও বানিয়ে কৃষিকাজে যেসব সমস্যা হয়, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কৃষিকাজের একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পাসতালা বলেন, আমরা যদি ভারতের প্রত্যেকে ছোটো ছোটো বাগান করে একটি করে মৌমাছি পালনের বাক্স বসাই তাহলে কেমন হবে? ভেবে দেখুন, একটি মৌচাক যেখানে ৪০ থেকে ৬০ হাজার পর্যন্ত মৌমাছি থাকে এবং মৌচাকের ২ কিলোমিটারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পরাগমিলন ঘটাতে থাকে।

কৃষিবিদদের মতে, আমাদের খাদ্য উৎপাদনে মৌমাছির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। প্রায় সত্তর শতাংশ ফল, সবজি, বাদাম, তৈলশস্য পরাগমিলনের ওপর নির্ভরশীল এবং বর্তমানে তা একটি বিষম সমস্যারূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রান্তিক কৃষকদের কাছে খাদ্যসুরক্ষা একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। তারা জানায়, আগে তারা ডাল-ভাত খেয়েই থাকত। তবে এখন পালঘরের মতো অপুষ্টির জেলায় তারা শাকসবজিও খেতে পাচ্ছে। আমগাছের তলার সোসাইটির পরিচালিকা সুজানা কৃষ্ণমূর্তি জানিয়েছেন যে এর ফলে প্রতিটি গ্রামের মহিলাদের জীবনশৈলী ও মনোবল দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরাটপাদা গ্রামের জসবন্তী খরাট জানান, মৌমাছি পালনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি। তিনি তাঁর গ্রামের ২১ জন মহিলার একটি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পরিবারও তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। এই উদ্যোগ মূলত মহিলা ক্ষমতায়ন এবং পুষ্টিবাগানের মতো বিষয়কে উৎসাহিত করে চলেছে। মধু বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন হয়, তার চোদ্দ শতাংশ বেশি অর্থ আসে জমির ফসল বিক্রি করে।

মৌমাছি পালনের মাধ্যমে ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষকদের উপার্জনের একটি পথ খুলে গেছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ফুলের মধু দক্ষিণ ভারতে এবং জোয়ানের মধু পাওয়া যায় রাজস্থানে। পাসতানা জানান যে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জানা উচিত যে, মৌমাছি না থাকলে আমরা ফল, খাবার কিছুই খেতে পেতাম না। মৌমাছি খাদ্য-শৃঙ্খলের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপনিষদে মৌমাছিকে একতার মধ্যে বিবিধতার প্রমাণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মৌমাছি বিভিন্ন ফুলের রস সংগ্রহ করে মধু প্রস্তুত করে, অথচ মধুর কোনো ফোঁটাকে পৃথক করা যাবে না, জানাও যাবে না কোন ফোঁটায় কোন ফুলের মধু আছে। মধু হলো একতার প্রতীক।

মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে মাতৃভাব। তাঁরা পারিবারিক উপার্জনে সহযোগিতা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনজনের জন্য মধু, শাকসবজি উৎপাদনও করে চলেছেন। সর্বোপরি, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাঁরা প্রত্যক্ষ যোগদান করছেন। □

বালিশ নিয়ে টানাটানি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

পৌরাণিক গল্পগাথায় মুনিঋষিরা নিদ্রাকালে বালিশের বদলে নিজের বাহুকে 'উপাধান' হিসেবে ব্যবহার করতেন। বালিশের একটা প্রতিশব্দ যেমন 'উপাধান' তেমনি অন্য একটা মানে হলো 'মূর্খ'। আগেকার দিনে নবাব বাদশাহরা পাশ ফিরে শোওয়ার সময় গালের জন্য ব্যবহার করতেন ছোটো ছোটো বালিশ। একে বলা হতে গালতাকিয়া। বালিশ ব্যবহারে নাকি বুদ্ধি বাড়ে। তবে এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। আমরা মূলত আরামের জন্যই বালিশ ব্যবহার করি।

বালিশ কেমন হবে

● এমন কোনও বালিশ ব্যবহার করবেন না যেখানে মাথাটা সামনের দিকে বা পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকে।

● বালিশ যেন খুব শক্ত না হয়।

● বালিশ কখনও খুব উঁচু হওয়া ঠিক নয়।

● প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বালিশ থাকা উচিত।

বালিশে শোওয়ার উপকারিতা

● বালিশের সঙ্গে ঘুমের একটা মানসিক যোগ আছে। আমরা ছোটোবেলা থেকে বালিশে ঘুমাই। তাই বালিশে শোওয়া আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয় আর বালিশে না শুলে ঘুম আসতে চায় না।

● যদি লেফ্‌ট ভেন্টিকুলার ফেলিয়োর হয় তাহলে বালিশ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রোগী মাথাটা উঁচু করে শুতে পারে, তাই তার কষ্টের উপশম হয়।

● যদি হার্টের পেরিকার্ডিয়ামের ভেতরে জল জমে তাহলে রোগীর নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। তখন রোগীকে মাথায় উঁচু বালিশ দিয়ে শোওয়ানো হয়, তাতে নিঃশ্বাসের কষ্ট কমে।

● কারও যদি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকে বা ফুসফুসে বা পেটে জল জমে, তাহলে মাথায় উঁচু বালিশ দিয়ে শোওয়ালে রোগীর কষ্ট অনেকটাই কমে।

● চিত হয়ে শোওয়ার সময় বালিশ না হলে তবু হয়, কিন্তু পাশ ফিরে শোওয়ার সময় বালিশ অবশ্যই প্রয়োজন, নাহলে মাথাটা নীচু হয়ে থাকে ফলে ব্যথা হতে পারে।

● বালিশ ছাড়া শুলে শিরদাঁড়ার সার্ভাইকাল অংশের বক্রতা বেড়ে যায়। আবার বালিশে শুলে এই বক্রতা কমে যায়।

● ঘাড়ের পেশি যেমন নরম তেমন ব্যস্ত। এই ঘাড়ের বেশিকে উপযুক্ত বিশ্রাম দেবার জন্য বালিশ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে।

বালিশ ব্যবহারে ক্ষতি

● রক্তচাপ কম থাকলে মাথায় বালিশ ব্যবহারে ক্ষতি হয়। তবে পায়ে বালিশ দেওয়া উচিত। এতে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বেশি হয় ও রক্তচাপ বাড়ে।

● বেশি উঁচু বালিশে ঘুমালে অনেকেরই সার্ভাইকাল স্পনিলোসিস হয়, ফলে ঘাড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়।

● বালিশের তুলো বা তুলোর গুঁড়ো শোওয়ার সময় নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে পৌঁছয়, যা অ্যালার্জির সৃষ্টি করে।

● উপুড় হয়ে বালিশে শোওয়ার ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের জটিলতা বাড়ে।

● বেশি উঁচু বালিশে ঘুমালে পিঠে স্পন্ডিলোসিস হতে পারে।

● মাথাটা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে শিরদাঁড়ার পুরোটা একই সরলরেখায় থাকে না, হলে শিরদাঁড়ার ক্ষতি হবে।

● অনেক সময় বালিশের খাঁজে মাইট নামে এক ধরনের আণুবীক্ষণিক জীব বাস করে। এদের দেহ নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ হাঁপানির সৃষ্টি করে। তাই বালিশ মিয়মিত রোদে দিতে হবে। বালিশের ঢাকনা গরম জলে নিয়মিত কাচা দরকার। □

দেশ-জাতি-সমাজ রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণের উৎসব রাখিবন্ধন

ড. প্রণব বর

যদিও হিন্দু সমাজের ভাইদের বোনদের দ্বারা রক্ষাসূত্র বাঁধার পারিবারিক উৎসব রাখিবন্ধন হিসেবে প্রচলিত হলেও এই উৎসবটি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে সমাজের পথপ্রদর্শক শ্রেণী ছিল শিক্ষক শ্রেণী। রক্ষাসূত্রের সাহায্যে এই দেশের জ্ঞান ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সমাজের বাকি অংশকে উদ্বুদ্ধ করতেন। পুরোহিত শ্রেণীও রক্ষা-সূত্রের মাধ্যমে সমাজ রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। রাজকীয় ব্যবস্থায় রাজপুরোহিত রাজাকে ধর্ম ও সত্য রক্ষার পাশাপাশি সমগ্র জনগণকে রক্ষা করার জন্য সংকল্প করাতেন। আজও যে কোনও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে, উপস্থিত সকলকে রক্ষাসূত্রের মাধ্যমে সুরক্ষার শপথ নেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, রাখিবন্ধনের মৌলিক অর্থ হলো সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী তাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য ও দায়িত্ববোধের উপলব্ধির কথা মাথায় রেখে সমাজের সর্বোত্তম মূল্যবোধ এবং সমাজকে রক্ষা করার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার হিন্দু সমাজে ঐক্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই সমগ্র হিন্দু সমাজকে সম্মিলিত ভাবে রক্ষা করার অঙ্গীকার গ্রহণের দায়িত্ববোধকে তুলে ধরতে এই উৎসব উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিনি এই উৎসবকে ভব্যরূপে সমাজের সামনে তুলে ধরেন এবং একে সামাজিক উৎসব হিসেবে পরিচিতি প্রদান করেন।

সঙ্ঘের উৎসব রূপে সংস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থ সম্প্রসারিত হয় এবং সীমিত অর্থে সীমাবদ্ধ না হয়ে এটি একটি বিস্তৃত অর্থে সমাজের প্রতিটি অংশকে রক্ষা করার অঙ্গীকার গ্রহণের উৎসবে পরিণত হয়। সঙ্ঘের লক্ষ্য হলো সচেতনতা তৈরি করা, যাতে সমাজের কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন বা নিরাপত্তাহীন বোধ না করে। সঙ্ঘ যে সে কাজে সফল তা আজ আমরা ভারতের প্রতিটি প্রদেশের অলিতে গলিতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে রাখিবন্ধন উদ্‌যাপিত হতে দেখে আনন্দিত হই।

রক্ষাবন্ধনের অর্থ

'রাখিবন্ধন' অথবা 'রক্ষাবন্ধন' শব্দটি মূলত দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত, একটি রক্ষা বা রাখি এবং অপরটি বন্ধন। রাখি রক্ষা শব্দের অপভ্রংশ শব্দ অথবা তদ্ভব শব্দ। রাখীবন্ধনের অর্থ কাউকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে পালিত উৎসব অনুষ্ঠান অথবা ব্রত। একই ভাবে উৎসব দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত— উৎ + সব। 'উৎ' অর্থ সেরা বা চরম এবং 'সব'-এর অর্থ— যজ্ঞ, আনন্দ ইত্যাদি। অর্থাৎ উৎসব মানে আনন্দকে ঔৎকর্ষের চরমে নিয়ে যাওয়া। তাই বোন রাখি বাঁধতে গিয়ে বলে— 'দাদা! আমি তোমার আশ্রয়ে আছি, আমাকে সর্বত্র রক্ষা করো।' এই দিন বোন তার ভাই বা দাদার হাতে রাখি বেঁধে তাকে মিষ্টিমুখ করায়। ফলস্বরূপ, ভাইয়েরা তাদের বোনদের কেবল অর্থ বা উপহার শুধু নয়, তাদের সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দেয়। রক্ষাবন্ধন হলো সেই অমূল্য স্নেহের বন্ধন, যা সর্বস্ব দিয়েও শোধ করা যায় না, টাকা তো অনেক দূর।

রাখিবন্ধন পারস্পরিক আস্থার উৎসব। এই উৎসবে যারা সামর্থ্যবান, তারা অন্যদের আশ্বস্ত করেন যে তারা যেন নির্ভীক হন, যে কোনো সংকটে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন। সঙ্ঘ এই উৎসব এবং তার কোটি স্বয়ংসেবকের মাধ্যমে সমাজে এই বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করছে। প্রসঙ্গত, সঙ্ঘ নিজেকে সমাজেরই একটি অভিন্ন অত্যাবশ্যক তন্ত্র বলে নিজেকে মানে। রাখিবন্ধন উৎসবে স্বয়ংসেবকরা সেই সংকল্পকে স্মরণ করার জন্য পবিত্র গৈরিক ধ্বজে একটি রাখি বা রক্ষাসূত্র বেঁধে দেয়, যাতে বলা হয়, 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ', অর্থাৎ আসুন আমরা সবাই মিলে ধর্মরক্ষা করি। সমাজে মূল্যবোধের রক্ষা করি। নিজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য রক্ষা করি, তবেই ধর্ম সমগ্র সমাজকে রক্ষা করতে পারবে। এটা ধর্মের ব্যবহারিক দিক। ধর্ম কোনো বাহ্যিক উপাদান নয়, এটি আমাদের সকলের মধ্যে নিহিত অথবা প্রকাশিত উচ্চ অভিব্যক্তির নাম। আমাদের আচার-আচরণে মানুষের জন্য যা ভালো, যা চিরন্তন সত্য, সেটাই ধর্ম। ধ্বজের সঙ্গে রাখির সুতো বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যও সমাজের স্বার্থে মহৎ ঐতিহ্য রক্ষা করা। প্রেয় কে শ্রেয়ের সঙ্গে যুক্ত করো— 'ঈপ্সিতং ধর্মং যোজয়েৎ'। স্বয়ংসেবকরাও একে অপরের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হন। জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, সম্পদ, শিক্ষা বা সামাজিক মর্যাদার ভেদ অর্থহীন। রাখিবন্ধনের সূত্র এই সমস্ত বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের ঊর্ধ্বে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটি সম্প্রীতির ঐক্য স্থাপন করে। এই ছোটো সুতোয় স্বয়ংসেবকরা এক মুহূর্তে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। ঐতিহ্যে ও পরম্পরার প্রভেদ ও কুসংস্কারের মালিন্য দূর হয়। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাসের অনুভূতি গভীরভাবে সৃষ্ট হয়।

শাখার এই কার্যক্রমের পরে স্বয়ংসেবকরা নিজ সমাজের সেই সমস্ত এলাকায় যান যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঞ্চিত ও অবহেলিত।

সেই সকল বঞ্চিত ও অবহেলিতদের মাঝে বসে তাদের হাতে বেঁধে দেয় রাখি, আমরা সেই সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করি, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— সমানং সর্ব ভূতেষু। এটি একটি অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান যখন লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক এই দেশের হাজার হাজার গ্রামে-শহরে বসবাসকারী লক্ষাধিক সেই সকল ব্যক্তি, যারা জাগতিক সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের পরিবারে বসে রক্ষাবন্ধনের চেতনায় আত্মপ্রকাশ করে, বাস্তবায়িত করে চিন্তা জগতের তত্ত্বকে। বিগত বছরগুলোর এ ধরনের কর্মসূচির কারণে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে ঐক্য ও সম্প্রীতি বোধের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর পেছনে সঙ্ঘের এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক রয়েছে।

এর পেছনে লক্ষ্য ও অনুভূতি হচ্ছে গোটা সমাজকে রক্ষা করার ব্রত নিতে হবে। জীবনের সর্বোত্তম মূল্যবোধ রক্ষার জন্য মানুষকে ব্রত নিতে হবে। একটি শক্তিশালী, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সমাজই হতে পারে একটি দেশের শক্তির ভিত্তি। সঙ্ঘ এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। রক্ষাবন্ধনের এই উৎসব এই মহা অভিযানের মূর্তরূপ।

রক্ষা সূত্র

ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসের বন্ধন হলো মূল এবং রাখিবন্ধন হলো এই বিশ্বাসের বন্ধন। এই উৎসবটি কেবল সুরক্ষার সুতো হিসেবে রাখি বেঁধে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় না, তবে ভালোবাসা, সমর্পণ, আনুগত্য এবং সংকল্পের মাধ্যমে হৃদয়কে আবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। রাখিবন্ধন শুধু ভাই-বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আপত্কালে, নিজের সুরক্ষার জন্য বা কারও বয়স ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য রক্ষাসূত্র (রাখি) বাঁধা বা পাঠানো হতো। ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে— 'ময়ি সর্বমিদম্ প্রোতং সূত্রে মণিগণ ইব'— অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর বলছেন, আমিই সেই সূত্র যাতে সকল জাগতিক বস্তু মণিমালার মতো গ্রথিত হয়ে আছে। অর্থাৎ 'সূত্র' ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক, যেমন সূত্র (সুতো) বিক্ষিপ্ত মুক্তোকে মালাতে একত্রিত করে। মালার সুতোর মতো রক্ষাসূত্রও মানুষকে সংযুক্ত করে। সুতরাং তুচ্ছ সূতো নয়রে এ ভাই, আছে এতে শক্তি।

নানা নামে রাখিবন্ধন

শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে, ভারতে ভাই ও বোনের ভালোবাসা ও সুরক্ষার পবিত্র উৎসব রক্ষাবন্ধন বা রাখিবন্ধন পালিত হয়। শ্রাবণে উদ্‌যাপিত হওয়ায় একে শ্রাবণী, সাওয়াইনি বা সালোনো নামেও ডাকা হয়। রক্ষাবন্ধন উৎসব যা ভ্রাতৃপ্রেমকে গভীর করে, একটি ভাই ও বোনের মধ্যে স্নেহের অকথিত শপথের প্রতীক। প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় রাখিবন্ধন বা রক্ষাবন্ধন। এই দিনে, বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে একটি নরম সুতো বেঁধে দেয়। এই সূত্র তাদের মধ্যে প্রেম এবং স্নেহ প্রতীক। এই সূত্রটি ভাইকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে তার বোনকে প্রতিটি অসুবিধা এবং বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

শাস্ত্র মতো রক্ষাবন্ধন

ভবিষ্যোত্তর পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, হেমাদ্রি লিখেছেন যে—ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের ডান হাতে রক্ষাসূত্র বন্ধন করে এতটাই সক্ষম করে তুলে ছিলেন যে, তিনি অসুরদের সহজেই পরাজিত করেছিলেন। যখন পূর্ণিমা চতুর্দশী বা আসন্ন প্রতিপদ একসঙ্গে যুক্ত হয়, তখন কোনো রক্ষাবন্ধন হওয়া উচিত নয়। এ দুটি থেকে দূরে থাকতে হলে রাতেই রক্ষাবন্ধন করে নিতে হবে। এই কাজটি এখনও করা হয় এবং পুরোহিতরা তাদের ডান হাতে একটি রক্ষাসূত্র বেঁধে দেয়। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রের ঝড় কমে যায় এবং সমুদ্রদেবতাকে একটি নারকেল নিবেদন করা হয় যাতে তিনি বণিক জাহাজের বিপদ দূর করতে পারেন।

পৌরাণিক কথা

ভবিষ্যপুরাণের একটি কাহিনি অনুসারে, প্রাচীনকালে একবার বারো বছর ধরে দেবাসুর-যুদ্ধ হয়েছিল, যাতে দেবতারা পরাজিত হয়েছিলেন। শোকগ্রস্ত ও পরাজিত হয়ে ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির কাছে গেলেন। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীও সেখানে ছিলেন। ইন্দ্রের কষ্টের কথা জেনে ইন্দ্রাণী বললেন— 'আগামীকাল শ্রাবণী পূর্ণিমা। আমি পদ্ধতিগতভাবে রক্ষাসূত্র প্রস্তুত করব। স্বস্তিবচন আদি উচ্চারণ পূর্বক আপনি তা ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বহস্তে বেঁধে নেবেন। আপনারা অবশ্যই বিজয়ী হবেন।' দ্বিতীয় দিনে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে দিয়ে ইন্দ্রাণীর করা 'রক্ষাবন্ধন' উৎসব পালিত হতে থাকে। এই দিনে, বোনেরাও তাদের ভাইদের মণিবন্ধে রক্ষাসূত্র বেঁধে তাদের সুখী জীবন কামনা করে থাকে।

রামায়ণের ঘটনায় রক্ষাবন্ধন

রাবণের সঙ্গে সম্মুখ সমরে বানর সেনাদের হাতে রক্ষাসূত্র বন্ধনের কথা প্রচলিত। একই ভাবে রক্ষার ভাবনায় প্রেরিত হয়ে মাতা সীতার দ্বারা লবকুশকেও কুশাগ্র ও কুশের লবভাগ বন্ধনের দ্বারা একপ্রকার রক্ষাবন্ধনই পালিত হয়েছিল।

মহাভারতের কথায়

হিন্দু পুরাণে এই উৎসবের বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায়। মহাভারতে কৃষ্ণ শিশুপালকে তার চক্র দিয়ে হত্যা করেছিলেন। শিশুপালের শিরশ্ছেদ করে চক্র যখন কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসে, সেই সময় কৃষ্ণের আঙুল কেটে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের আঙুল থেকে রক্ত বের হতে থাকে। এই দেখে দ্রৌপদী তার শাড়ির প্রান্ত ছিঁড়ে কৃষ্ণের আঙুলে বেঁধে দেন, যা নিয়ে কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঋণ শোধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন দুঃশাসনের দ্বারা বস্ত্রহরণের সময়ে। সেই থেকে 'রক্ষাবন্ধন' উৎসব পালনের প্রচলন হয়েছে।

মহাভারতের আরেকটি গল্পে

একবার যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন— 'হে অচ্যুত! আমাকে রক্ষাবন্ধনের গল্প বলুন, যা মানুষের অশুভ আত্মা ও দুঃখ দূর করে। এতে ভগবান বললেন— 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! প্রাচীনকালে একবার দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বারো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হন। দেবতারা হতমান হলেন। ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দেবতাদের সঙ্গে অমরাবতীতে গিয়ে বিজয়ের আশায় আহুতি দেন। বিজয়ী দৈত্যরাজ তিনটি জগৎকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন এবং রাজকীয় পদে ঘোষণা করেছিলেন যে ইন্দ্রদেব সমাবেশে আসবেন না এবং দেবতা ও মানুষেরা যজ্ঞ করবেন না। সবাই আমার পূজা করুক, এতে যার আপত্তি আছে সে যেন রাজ্য ত্যাগ করে। অসুর রাজার এই আদেশে যজ্ঞ, বেদপাঠ ও উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ধর্মের বিনাশের ফলে দেবতাদের শক্তি কমতে থাকে। অন্যদিকে রাক্ষসদের ভয়ে ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে বললেন— হে গুরুদেব! আমি শত্রু দ্বারা ঘেরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে চাই। নিয়তিই শক্তিশালী, যা হবার তাই হবে। প্রথমে বৃহস্পতি বুঝিয়েছিলেন যে রাগ করা বৃথা। কিন্তু ইন্দ্রের জেদ ও উৎসাহ দেখে তিনি রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠান করতে বলেন। শ্রাবণ পূর্ণিমায় ভোরে রক্ষাবন্ধন সম্পন্ন হয়।

'যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামভিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।'

অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য রাক্ষস-সম্রাট মহাবলীকে রক্ষাসূত্রের দ্বারা বাঁধা হয়েছিল (রক্ষাসূত্রের প্রভাবে, বামন তার সর্বস্ব ভগবানকে দান করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হননি), তাই রক্ষাসূত্র! আজ আমি তোমাকে বেঁধে রাখি, আপনিও আপনার উদ্দেশ্য থেকে বিভ্রান্ত হবেন না, দৃঢ় থাকুন।

দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনেই

মন্ত্র পাঠ করে রক্ষা বিধান করেছিলেন। বিত্রাসুর বিনাশকারী ইন্দ্র, তার সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী-সহ বৃহস্পতির কথা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছিলেন এবং রাক্ষসদের জয় করেছিলেন।

আজও রক্ষাবন্ধনের দিনে দেশের অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণ, পুরোহিতরা তাদের সমৃদ্ধির জন্য তাদের যজমানকে রক্ষাসূত্র বা রাখি বাঁধেন এবং যজমান তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে দক্ষিণা প্রদান করেন। রাখি বাঁধার সময় এই মন্ত্রটিই ব্রাহ্মণেরা পাঠ করেন।

রাজা বলির গল্প

আরেকটি কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করেন এবং রাজা বলিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে বলির রাজ্য রক্ষা করতে যান। তারপর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন দেবী লক্ষ্মী ব্রাহ্মণী রূপে রাজা বলির হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে তাঁর মঙ্গল কামনা করেন। এতে মুগ্ধ হয়ে বলি দেবীকে নিজের বোন মনে করে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন। তারপরে দেবী লক্ষ্মী তার আসল রূপে আবির্ভূত হন এবং তার কথায়, বলি ভগবান বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন।

রক্ষাবন্ধনের বিভিন্ন রূপ

মুম্বাইয়ের অনেক সমুদ্র এলাকায় এটি 'নারকেল-পূর্ণিমা' বা 'কোকোনাট ফুল মুন' নামেও পরিচিত। এই দিনে সমুদ্র দেবতাকে নারকেল নিবেদন করে বিশেষভাবে পূজা করা হয় এবং নারকেলের তিনটি চোখকে শিবের তিনটি চোখের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

বুন্দেলখণ্ডে রাখিকে 'কাজরী পূর্ণিমা'ও বলা হয়। এই দিনে বাটিতে বার্লি ও ধান বপন করা হয় এবং সাতদিন জল দেওয়ার সময় মা ভগবতীর পূজা করা হয়।

উত্তরাঞ্চলের চম্পাওয়াত জেলার দেবীধুরা মেলায় রাখি-উৎসবের দিনে বারাহী দেবীকে খুশি করার জন্য প্রস্তরযুগের অনুকরণে প্রস্তর যুদ্ধের আয়োজন করা হয়, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'বাগওয়াল' বলা হয়।

সন্তোষী দেবীর জন্মকথায় গণেশ কার্তিকেয়র ভগিনী রূপে তার জন্ম হয়। এবং তারপর দেবী সন্তোষীর দ্বারা তার দুই ভাইকে রক্ষাবন্ধনের প্রাচীন লোককথা প্রচলিত আছে।

বাংলায় প্রচলিত বিপত্তারিণী ব্রতে দর্ভ ও সূত্রের দ্বারা মঙ্গল ও রক্ষা ভাবনার উল্লেখ মেলে। উল্লেখ্য বৈদেশিক আক্রমণোত্তর সামাজিক অবক্ষয়জনিত সংস্কার ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুতির থেকেও এখানে রক্ষার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

রক্ষাবন্ধন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালে হরিয়ানা রাজ্যের কাইথাল জেলার ফতেপুর গ্রামে এক যুবক গিরিধারীলালকে ব্রিটিশরা রক্ষাবন্ধনের দিনে কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়। এরপর গ্রামের মানুষ গিরীধাবীলালের স্মরণে রক্ষাবন্ধন উৎসব বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৬ সালে যখন দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৫০ বছর পূর্ণ হলে, তখন এই গ্রামের মানুষ পুনরায় এই উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রচার করে রক্ষাবন্ধনকে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। উনিশ শতকে বাঙ্গলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে অপরিমিত ভয়ের কারণ হয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তারা বাঙ্গলাকে দু' ভাগে ভাগ করবে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ-সহ ভারতের বিভিন্ন নেতা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। একথাও অবিসংবাদিত ও সর্বগ্রাহ্য যে, রবীন্দ্রনাথের নির্ধারিত পথে বাঙ্গলার জনহৃদয়ে রাখিবন্ধন পারিবারিক, ব্যক্তিগত অথবা ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উৎসব রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই ১৯০৫ সালের কার্জনের সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আন্সেটেল করে তিনি বঙ্গপ্রদেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক চক্রান্তকে বিফল করে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন ও তাৎক্ষণিক ভাবে সফলও হন। ■

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং রাখিবন্ধন

রাজদীপ মিশ্র

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন, 'উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ'। উৎসবের মাধ্যমে মানুষে মানুষে হৃদয়ের ভাব আদান-প্রদান হয়, মানুষ দেশ-ধর্ম-সমাজ রক্ষার কথা চিন্তা করে; ধর্মরক্ষার তাগিদে দেশকে শক্তিশালী ও অখণ্ড রাখার প্রতিজ্ঞা করে।

প্রতিবছর শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে সারা ভারতবর্ষে রক্ষাবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, সুশ্রুত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, সংসূত্র সংস্থান, হরিভক্তিবিলাসে রাখিবন্ধনের উল্লেখ আছে।

ইংরেজদের পরাধীনতার হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য সারা ভারতের সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশে যে ব্যাপক আন্দোলন চলছিল তাকে স্তিমিত করার জন্য কুচক্রী কার্জন বঙ্গ ভাগ করার চক্রান্ত করেছিল। স্থির হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করা হবে। কিন্তু এই দিনটিকে তো শোকে হা-হুতাশ করে কাটালে হবে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনে এই দিনটিকে করে তুলতে হবে পূর্ণ-প্রাণবন্ত। রচনা করতে হবে প্রস্তাবিত দুই প্রদেশের মধ্যে মিলনের নতুন ঐক্যবন্ধন। এই কাজটি হবে রাখিবন্ধনের মাধ্যমেই। এর প্রস্তাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে প্রস্তাবিত এই বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন। এই উৎসবের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন মৌলবি লিয়াকত হোসেন। সেদিন রাখিবন্ধন বঙ্গপ্রদেশে এনে দিয়েছিল এক নতুন স্রোত। ফলস্বরূপ ১৯০৫ সালের সেটেল্ড ফ্যাক্ট ১৯১১ সালের পরিণত হয় আনসেটেল্ড ফ্যাক্টে। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ার পরও লিয়াকত হোসেন এই জাতীয় উৎসবটিকে রক্ষা করেছিলেন বেশ কয়েক বছর।

১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিনে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘ দৈনন্দিন শাখার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত অনেক উৎসবের মধ্যে সেই ছটি উৎসবই পালন করে, যার মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত গৌরব, বিজয় এবং পরম্পরা আছে এবং যে উৎসব ভারতীয় তথা হিন্দু জীবনকে সুসংহত ও গৌরবান্বিত করে, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যকে প্রকটিত করে, সকলের মনে দেশ-ধর্ম রক্ষা করার প্রবৃত্তি জাগ্রত করে। এই ছটি উৎসবের মধ্যে একটি হলো রাখিবন্ধন।

ডাক্তার হেডগেওয়ার রাখিবন্ধন উৎসবকে একতার বন্ধন হিসেবে সমাজের সামনে স্থাপন করলেন। রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে রাখির যে বিশেষ একটি ভূমিকা আছে— একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

'রাখি' কথাটা এসেছে রক্ষা শব্দ থেকে। ব্যক্তি যেমন পরিবারকে রক্ষা করবে, তেমনই সমাজও ব্যক্তি এবং পরিবারকে রক্ষা করবে। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত তার একটি বহিঃপ্রকাশ রাখিবন্ধনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তি যেমন পরিবারকে রক্ষা করার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করে, ঠিক তেমনই ব্যক্তিরও পরিবার ও সামাজকে রক্ষা করার জন্য সর্বস্ব অর্পণের মানসিকতা থাকা উচিত।

এই উৎসব সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা বলে। আজ যখন আমরা চারদিকে নীতিহীনতা, বিশ্বাসহীনতা, চরিত্রহীনতা, আদর্শহীনতা দেখতে পাই তখন এই রাখিবন্ধন উৎসব যেন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক দিক ফিরিয়ে আনার কথা বলে। সেজন্য রাখিবন্ধন উৎসব একটি সামাজিক কাজও বটে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দু রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে কর্তব্য আধারিত। রাখিবন্ধন উৎসব সেই পথকে প্রসারিত করে।

সঙ্ঘ এবং বিবিধ সামাজিক সংগঠন রাখিবন্ধন উৎসব চিরাচরিত শাস্ত্রীয় ভাই-বোনের মধ্যে সীমিত না রেখে সমাজের সর্বস্তরে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময় ও সামাজিক সংহতি এবং সম্প্রীতির মেলবন্ধন স্থাপন করেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় সমগ্র ভারতবাসী এক সংকল্প সূত্রে গ্রথিত হোক। ভারতবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আজ সক্রিয়। ধর্মীয় কট্টরবাদী সংগঠনগুলো নানাভাবে সক্রিয়। মাতৃশক্তি আজ

অসুরক্ষিত।

আমাদের জাতীয় জীবনে রাখি মিলিত হওয়ার জন্য; মিলিত হয়ে রক্ষার অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য। বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়। তাই বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আমরাও রাখিকে এক জাতি এক প্রাণ গঠনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করি।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা একাত্মতার মন্ত্র নিয়ে নতুন ভারত গড়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সমাজের মধ্যে ভেদ বিভেদের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলা রাখির অপর এক অঙ্গীকার। স্বয়ংসেবকরা শাখায় গান গায়— 'ভেদ বিভেদের প্রাচীরটাতে হানোরে আঘাত/কাটুক যত অন্ধ তামস দুঃস্বপ্নের রাত।' পরস্পরকে রক্ষা করার অঙ্গীকারবোধ বর্তমান প্রজন্মকে শুধুমাত্র সুরক্ষিত ও শক্তিশালীই করে না উপরন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়।

ঐক্য ও সাহসের জন্য ১৯০৫ সালে দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজ শাসক তার গৃহীত সিদ্ধান্ত ১৯১১ সালে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার মাত্র ৪২ বছর পর ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় দেশ বিভাজিত হলো। এর কারণ কী? ১৯০৫ সালে যে ঐক্য, সাহস, সততা, বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ দেশের মানুষকে জাগ্রত করেছিল, ১৯৪৭ সালে তার জোর অনেকটা কমে গিয়েছিল। আজও কিন্তু ভারত বিভাজনের কুশীলবরা সমানভাবে উৎসাহী ও সক্রিয়। দেশের সংহতি বজায় রাখার চেষ্টায় সমগ্র ভারতবাসীকে যুক্ত করতে হবে। সঙ্ঘ হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করে। জনজাগরণের কাজ করে। দেশের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে এক সূত্রে গেছে গেঁথে সহস্র জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেবার উৎসব এই রাখিবন্ধন। ধর্ম রক্ষা, সমাজ রক্ষা, রাষ্ট্ররক্ষার অঙ্গীকার নিয়েই এই উৎসব।

আজ ভারতবাসী তথা হিন্দুদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। ডাক্তার হেডগেওয়ার ১৯৩৩ সালের এক শীতকালীন শিবিরে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো বলেছিলেন, 'পূর্বের গান্ধার আজ আফগানিস্তান হয়ে গেছে। সেইভাবে আজকের হিন্দুস্থানকে যেন আমাদের ইসলামস্থান রূপে দেখতে না হয়।' এই আশঙ্কা সর্বক্ষণ মনে উদয় হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ডাক্তারজী সতর্ক করে দিলেও অধিকাংশ দেশবাসীর তা বোধগম্য হয়নি। হিন্দু অনৈক্যের সুযোগে এবং রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য আমাদের মাতৃভূমি খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। দেশের যে যে অংশে হিন্দুর সংখ্যা কমেছে, সেই অংশগুলিতে দেশবিরোধী শক্তি পুনরায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'হিন্দু কমলে দেশ বিভক্ত হবে'— এই প্রবাদটি বহুবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

হিন্দু বিরোধী চক্রান্তকে রুখতে গেলে হিন্দু ঐক্য ছাড়া গতি নেই। রাখিবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যেই আমাদেরকে এগোতে হবে। সমাজের সুরক্ষা নির্ভর করে সমাজের পারস্পরিক ঐক্য ও সংগঠনের ওপর। এই কাজ সম্ভবপর হয় সমাজে মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসায়। সঙ্ঘ কাজের ভিত্তি হলো সমাজের প্রতি অকুণ্ঠ, অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা ও ভক্তি ভাব। তাই আমরা বলি 'প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নম্ সায়াহ্নানাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি রাষ্ট্রমাতঃ তদন্ত তব পূজনম্।।' সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমি যাই করি না কেন হে রাষ্ট্রমাতা তা যেন তোমার পূজা হয়ে ওঠে।

যারা এই দেশকে কর্মভূমি, ধর্মভূমি, মোক্ষভূমি, পুণ্যভূমি বলে মনে করে— এই দেশ রক্ষার দায়িত্ব তাদের। ভারতকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতীয়দের। বর্তমান যুবসমাজ এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

এই রাখি এক টুকরো সুতোর বন্ধন নয়। এ হলো রাষ্ট্ররক্ষা সূত্র, সম্প্রীতি রক্ষা সূত্র, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার সূত্র। এই ভাবনা নিয়েই ডাক্তারজীর প্রদর্শিত পথে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজও রাখিবন্ধন উৎসব পালন করে চলেছে।

আমরা তাই বলি,

'দেশরক্ষা সমং পুণ্যং দেশরক্ষা সমং ব্রতম্।
দেশরক্ষা সমো যাগ দৃষ্টো নৈব চ নৈব চ'।।

দেশরক্ষার সমান পুণ্য, দেশরক্ষার সমান ব্রত এবং দেশ রক্ষার সমান যজ্ঞ দেখা যায় না অর্থাৎ দেশ রক্ষাই সর্বোত্তম কাজ। ■

এক ভারতীয় পরম্পরা

রাখিবন্ধন

অশোক কুমার ঠাকুর

ভারতীয় লোকজীবনে যতগুলো পার্বণ ও উৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রাখিবন্ধন বা রক্ষাবন্ধন উৎসব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'রক্ষাবন্ধন' শব্দবন্ধে একে অপরের সুরক্ষার অঙ্গীকার স্বীকৃত। রাখিপূর্ণিমা ভ্যালেন্টাইন ডে-র মতো আধুনিককালে সৃষ্ট কোনো 'দিবস' নয়। 'রাখিপূর্ণিমা' ভারতীয় পরম্পরানুযায়ী একটা বিশেষ তিথি।

আমরা মহাভারতের ঘটনা থেকে জানতে পারি যে, সত্যযুগ থেকে রাখি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। একবার জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে অচ্যুত, তুমি আমাকে রক্ষাবন্ধন সম্বন্ধে এমন কথা শোনাও যাতে মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর হয়ে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, প্রাচীনকালে একবার দীর্ঘ বারো বছর ধরে দেবাসুরের যুদ্ধ চলছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে হেরে গিয়ে বিজয়ের আশা ত্যাগ করে দেবতাদের নিয়ে স্বর্গ ছেড়ে অমরাবতীর গহিন অরণ্যে আশ্রয় নেন। স্বর্গ বিজেতা দৈত্যরাজ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিলোক নিজের অধীনে এনে ঘোষণা করলেন, এখন থেকে আর কোনোরকম যজ্ঞকর্ম হবে না। তোমরা শুধু আমাকে পূজা করবে, আমাকে ভজনা করবে, অন্যথায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।' দৈত্যরাজের এই ঘোষণার ফলে বেদপাঠ, যাগযজ্ঞ, উপাসনা, ধর্মাচারণ, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান সব লাটে উঠলো। ধর্মনাশ হওয়ার ফলে দেবতারা দিন দিন হীনবল হতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে ইন্দ্র সমহিষী দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন। পরের দিন ছিল শ্রাবণীপূর্ণিমা। দেবগুরুর নির্দেশে পূর্ণিমার দিন সকালবেলা ইন্দ্র ও তাঁর মহিষী ইন্দ্রাণী স্নানসিক্ত দেহে শুদ্ধবস্ত্রে, শুদ্ধচিত্তে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞ শেষে এক টুকরো মন্ত্রপূত সুতো ইন্দ্রাণীর হাতে দিয়ে দেবগুরু বললেন, এটি স্বামীর ডান হাতে পরিয়ে দাও— এই হবে যুদ্ধে ইন্দ্রের রক্ষাকবচ। এরপর ইন্দ্র যুদ্ধে জয় লাভ করেন, পুরাণে কথিত আছে।

মহাভারতে আমরা দেখতে পাই, একবার অসতর্ক মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে যায় এবং টপ টপ করে রক্ত ঝরতে শুরু করে। দ্রৌপদী দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতস্থান বেঁধে দেন। কৃষ্ণা-দ্রৌপদী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বোনের মতো। যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হেরে গেলে দুঃশাসন এবং অন্যান্য কৌরব-ভ্রাতা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত হলো তখন শ্রীকৃষ্ণ পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্রের জোগান দিয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন। পুরাণ ও মহাভারতের দুটি ঘটনায় রাখি উৎসবের মাহাত্ম্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে রাখিবন্ধনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজান্ডার যখন পুরুর রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন পুরুর মহিষী, পুরুর হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশ রক্ষার জন্য। পরাজিত হয়েও মহারাজা পুরু দেশ রক্ষা করতে পেরেছিলেন— আত্মমর্যাদা বোধ ও সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ।

মুঘল আমলেও রাখিবন্ধনের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। চিতোরের রানি কর্ণাবতী মুঘল বাদশা হুমায়ুনকে সম্বোধন করে রাখি পাঠিয়েছিলেন চিতোরকে রক্ষা করবার জন্য, কারণ মুঘল বাদশাহের অনুগত নবাব বাহাদুর শা চিতোর জয় করে নিজের অধীনে আনতে চেয়েছিল। মুঘল বাদশার হাতে যখন চিঠি ও রাখি পৌঁছায় ততদিনে রানি কর্ণাবতী জহরব্রত পালন করে জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এই ঘটনা হুমায়ুনকে অত্যন্ত মর্মাহত করে এবং বাহাদুর শা-কে উপযুক্ত শাস্তি দেন। বিংশ শতাব্দীর আগে বঙ্গদেশে রাখিউৎসবের প্রচলন ছিল না। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ বিভাগের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্য রাখি উৎসবের ডাক দিলেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল।

তবে রাখির পবিত্র ধারণা বাঙালি মনন-মানসে চিরকালই ছিল। শিশু জন্মানোর পর তার পরমাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষীরা নবজাতকের সুস্থ সবলদেহ ও দীর্ঘায়ু কামনায় যে লাল সুতো পরিয়ে দেয় সে তো রাখিই। তাছড়া ষষ্ঠীতে গুরুজনেরা যে হলুদ সুতো বেঁধে দেন সেখানেও প্রতিভাত আমাদের চিরাচরিত মঙ্গল কামনা। অন্ধবিশ্বাস হলেও বলতে বাধা নেই— তাবিজ, কবজ, তাগা, মাদুলি, জালের কাঠি— এইসব (ভণ্ড সাধু, জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী ঠকবাজদের বাদ দিয়ে) যখন মাতৃ-পিতৃস্থানীয় কেউ পরিয়ে দেয় তখন তার মধ্যে থাকে আন্তরিক ও নির্ভেজাল আশীর্বাদ— এগুলোও একরকম রাখির প্রতীকী ভাবনা। 'রাখিবন্ধন' যথার্থ অর্থেই ভারতীয় পরম্পরা, কৃষ্টি সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ।

বর্তমানে অঞ্চল কেন্দ্রিক যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেটাও নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে, যদি ধর্ম-বর্ণ-দলমত- সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর মধ্যে রাখিবন্ধনের সদিচ্ছা জাগ্রত হয়। ■

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে অমৃত মহোৎসবের সমাপণ সমারোহ

গত ৬ আগস্ট সোনারপুর ইস্টার্ন রেলওয়ে সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউটের সত্যজিৎ মঞ্চে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার **অমৃত তর্পণ** অনুষ্ঠান **বন্দে জননী ভারতবর্ষ** অনুষ্ঠিত হলো সংস্থার ভাবসংগীতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কোষটোলির সদস্য তথা প্রান্ত পরামর্শদাতা ভরত কুণ্ডু, প্রখ্যাত ওডিশি নৃত্যসাধিকা শ্রীমতী মোনালিসা ঘোষ। শ্রীভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীর আদর্শ ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন এবং সোনারপুরে সংস্কার ভারতীর কাজ শুরুর পর থেকে বর্তমান স্থিতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ড. বসু তাঁর ভাষণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তুলে ধরেন। এরপর ভরত কুণ্ডু মহাশয়ের বন্দে মাতরম্ রাষ্ট্রগীত গায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় পাপিয়া ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ' ও আমার দেশের মাটি' গানটি পরিবেশনার মাধ্যমে। এরপর পরিবেশিত হয় কাব্যনৃত্যনাট্য **একটি দামাল ছেলের গল্পকথা**। রচনা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। আবৃতিতে অংশগ্রহণ করেন লিপিকা চৌধুরী ও কোয়েল নস্কর মালী। নৃত্যের মাধ্যমে কবিতার দৃশ্যায়ন পৌলমী মুখার্জী (ব্যানার্জী)। নেপথ্য সংগীতে কণ্ঠদান করেন স্নিগ্ধা পাল ও সঞ্চিতা ঘোষ দাস। আবৃত্তি, নৃত্য ও সংগীতের কোলাজে এক অসাধারণ উপস্থাপনা। এরপর ঋতা ঘোষের আবৃত্তি **প্রিয় নেতাজী** ছিল খুব সুন্দর। শেষ অনুষ্ঠান সংগীত-নৃত্যালেখ্য **বন্দে জননী ভারতবর্ষ**। রচনা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা সোনালী উত্থাসনী। নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন মোনালিসা ঘোষ। আলেখ্যে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে স্মরণ করে বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাধীনতার অত্যাচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আগামীতে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ভাষ্য-সংগীত-নৃত্য ও যন্ত্রসংগীতের সুযোগ্য মিলনে একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন প্রান্ত সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ওডিসি নৃত্যসাধিকা শ্রীমতী মোনালিসা ঘোষ এবং জেলা সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডল। সামগ্রিক অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন জেলার সহ সম্পাদিকা লিপিকা চৌধুরী। শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ কোন্নগরের উদ্যোগে জলছত্র ও চিকিৎসা সহায়তা শিবির

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ কোন্নগরের উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট তারেকেশ্বরগামী পুণ্যার্থীদের সেবার জন্য একটি জলছত্র এবং চিকিৎসা সহায়তা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের গৌতম রক্ষিত, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রশান্ত পাল ও সুমন ঘোষ।

বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে রক্তদান শিবির

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১১ আগস্ট মালদহ জেলার বাচামারী গভঃ কলোনীস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে ভারতমাতার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বসুর ১১৬ তম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে দশমতম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের সূচনা করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ অশোক চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধি দল, শিশু মন্দিরের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, অভিভাবক- অভিভাবিকা এবং প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত সকলকে এবং সকলের পরিবারকে স্বদেশি সপ্তাহ পালনের জন্য অভিনন্দন জানান। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে রক্তদান শিবির। শিশু মন্দিরের সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, আচার্য-আচার্যা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী-সহ মোট ৫৬ জন রক্ত দান করেন। শিশু মন্দিরের সভাপতি অম্লান গাঙ্গুলি সকলকে জনসেবা তথা লোক কল্যাণকর কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসে মালদহ নগরে ভারতমাতা পূজা

প্রতি বছরের মতো এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মালদহ নগরে ফোয়াড়া মোড়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে ভারতমাতার পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল

সাড়ে ন'টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ভারতমাতা পূজা শুরু হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় টাউন হলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত, মালদহ বিভাগ কার্যবাহ শ্যামল পাল, বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ নায়েক, মালদহ বিভাগ সংগঠন সম্পাদক সন্দীপ দাস, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি অধ্যাপক তন্ময় সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রেমজ্যোতি নাথ, দক্ষিণ মালদহ জেলা প্রমুখ অলোক দাস, দক্ষিণ মালদহ জেলা সংযোজক সোমনাথ ঘোষ, মালদহ বিভাগ সংযোজক সুজিত মণ্ডল প্রমুখ। শুরুতেই কয়েক জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর সংস্কার ভারতী এবং সংস্কৃতভারতীর শিল্পীদের পরিচালনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সজল দত্ত, মানিক ঘোষ, অনুশ্রী সরকার, তনুশ্রী চৌধুরী, রুমা দে, কাকলি বিশ্বাস, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সাথী ঘোষ, শুক্লা রায় ও অনুষ্কা সরকার। আলোচনা সভায় বক্তাদের বক্তব্য সবাইকে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মালদহ নগর সভাপতি শতদ্রু বসাক।

জাতীয় সংহতি সাধনের এক বড়ো মাধ্যম

রাখিবন্ধন

সৌরভ সিংহ

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। বৃহৎ এক মিলনক্ষেত্র, যেখানে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং বহুবিধ ভাষা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধর্ম ও পন্থের মানুষ মিলেমিশে সহাবস্থান করে। বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত এই উৎসবগুলি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। রক্ষাবন্ধনও অন্যান্য উৎসবের মধ্যে একটি। রাখিবন্ধন বা রক্ষাবন্ধনকে মূলত উত্তর ভারতীয় উৎসব বলেই ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে কীভাবে এটি একটি সর্বভারতীয় উৎসবের রূপ পেয়েছে, যা একসময় শুধুমাত্র পারিবারিক আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

রাখিবন্ধন পরস্পরকে রক্ষা করার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে ভাইদের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করে থাকেন। এর বেশি এই উৎসবের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে একসময় এই উৎসব জাতীয় একতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গপ্রদেশ ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। যা অবশেষে ব্রিটিশ রাজের জন্য একটি ভয়ংকর হুমকি হিসেবে পরিগণিত হয়। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশরা বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৫ সালের জুন মাসে অসমে কার্জন সাহেব এবং একটি ইসলামিক প্রতিনিধি দলের মধ্যে একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে মুসলমানরা তাদের পরিচয় বজায় রাখার জন্য একটি পৃথক দেশের পরিকল্পনা করে। উদ্দেশ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে অসম ও সিলেটের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে আলাদা করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ তৎকালীন সমাজের রাষ্ট্রবাদী ব্যক্তিত্বরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রক্ষাবন্ধন উৎসবের অনুভূতিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং জাতীয় সংহতি রক্ষা করার জন্য রক্ষাবন্ধন উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর অসময়ে

এই উৎসব পালনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য হাজার হাজার মানুষকে সংগঠিত করেন। সম্প্রীতি ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বে নিদর্শন হিসেবে সকলে একত্রিত হয়ে একে অপরকে রাখি বাঁধতে আহ্বান জানান। বঙ্গপ্রদেশ, অসম, ঢাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ গঙ্গার তীরে একত্রিত হয়ে একে অপরকে রাখি বেঁধে এই জনজাগরণে অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক ভগবান'। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। এটি ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য বিজয়। সেই সঙ্গে এই উৎসব বঙ্গপ্রদেশে এক জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়।

রক্ষাবন্ধন শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে উদ্‌যাপিত হয়। সংস্কৃতে 'রক্ষাবন্ধন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'রক্ষা, যত্নের বন্ধন'। শব্দবন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা এই উৎসব 'রক্ষায় আবদ্ধ হওয়া'। এই রক্ষাসূত্র পবিত্র প্রেমের পরিচয়। ভাই ও বোনের মধ্যে অটুট বিশ্বাসের প্রতীক। এছাড়া এই উৎসবটি রাখি, সালোনি, শ্রাবণী এবং আরও অনেক নামেও পরিচিত। এই উৎসব নিয়ে শাস্ত্রগ্রন্থে অনেক গল্প আছে।

রক্ষাবন্ধনের এই পুণ্য ঐতিহ্য প্রাচীন মধ্যযুগ ও বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রূপে পালিত হয়। স্থানীয় লোককাহিনি এবং লৌকিক ইতিহাসে, রাখি বাঁধার ঐতিহ্য শুধুমাত্র ভাই ও বোনের সম্পর্কের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। যুদ্ধরত রাজ্যগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এটি একটি কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হতো।

আলেকজান্ডার যখন ভারতের কিছু অংশ আক্রমণ করে এবং প্রাচীন ভারতীয় রাজা পুরুর হাতে পরাজিত হন, সেই সময় আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোকসানা পুরুকে একটি রাখি পাঠিয়েছিলন। পুরু সানন্দে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং আলেকজান্ডারের জীবন বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র তার 'মধ্যযুগীয় ভারত'-এ উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয় মুঘল বাদশা হুমায়ুন চিতোরের রাজার বিধবা রানি কর্ণাবতীর কাছ থেকে একটি রাখি হিসেবে একটি ব্রেসলেট পেয়েছিলন। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে হুমায়ুন কর্ণাবতীর সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিন।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় প্রচলিত বৈদিক রক্ষা বিধানের চির শাশ্বত প্রথা অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে পালন করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটিকে ঝুলন পূর্ণিমাও বলা হয়। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রার্থনা ও পূজা করা হয়। বোনেরা ভাইদের রাখি বেঁধে অমরত্ব কামনা করে। রাজনৈতিক দল, অফিস, বন্ধু-বান্ধব, স্কুল থেকে কলেজ, রাস্তা থেকে প্রাসাদ এই দিনটি একটি ভালো সম্পর্কের নতুন আশা নিয়ে উদ্‌যাপন করে।

মহারাষ্ট্রে কোলি সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষাবন্ধন উৎসবটি নারালি পূর্ণিমা (নারকেল দিবসের উৎসব)-সহ পালিত হয়। কোলিরা উপকূলীয় রাজ্যের জেলে সম্প্রদায়। জেলেরা সাগরের দেবতা বরুণদেবের কাছে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। আচারের অংশ হিসেবে বরুণদেবকে নৈবেদ্য হিসেবে নারকেল সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। উত্তর ভারতে বেশিরভাগ অংশে জন্মাষ্টমী এবং রক্ষাবন্ধনের কাছাকাছি সময়ে ঘুড়ি ওড়ানো একটি সাধারণ প্রথা। যাকে স্থানীয় ভাষায় সাধারণত 'গাট্টু দরজ' বলা হয়। হরিয়ানায় রক্ষাবন্ধন উদ্‌যাপনের পাশাপাশি, লোকেরা 'সালোনো' উৎসব পালন করে। সালানো উৎসব পুরোহিতদের দ্বারা মানুষের হাতে মন্দের বিরুদ্ধে তাবিজ বেঁধে উদ্‌যাপন করা হয়। অন্য জায়গার মতো বোনোরা ভাইদের সুস্থতার জন্য প্রার্থনার সঙ্গে সুতো বেঁধে দেয় এবং ভাইরা তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপহার প্রদান করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও রক্ষাবন্ধন উৎসব পালন করে থাকে, তবে কোনো ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। সমস্ত দেশে সঙ্ঘ ও আনুষাঙ্গিক সংগঠন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, তীব্র স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় সংহতির অনুভূতি জাগরণের লক্ষ্যে এই সামাজিক উৎসবকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উন্নীত করেছে। চিরাচরিত ভাই ও বোনের ভালোবাসার প্রতীকের মধ্যে সীমিত না রেখে জাতীয়তাবোধ ও দেশের ঐতিহ্য বিষয়ে গর্ব ও শ্রদ্ধাবোধ তথা তীব্র স্বদেশপ্রেম জাগরণের কাজ করবে এই লক্ষ্য রেখেই সঙ্ঘ এই উৎসবটি বেছে নিয়েছে। ১৯১০ সালে ডাক্তারজী যে নিজে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে রক্ষাবন্ধন উৎসব পালন দেখেছিলেন। হয়তো সেখান থেকেই তার এই উৎসবের মহত্ত্ব অনুধাবন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সঙ্ঘের মধ্যে উৎসবের অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ হতে পারে।

সামান্য রাঙা রাখির একটি সুতো সারা দেশকে এত শক্তিশালী করে তুলতে পারে হয়তো রবীন্দ্রনাথ আগেই অনুধাবন করেছিলেন। সঙ্ঘও রক্ষবন্ধনের গুরুত্ব যথাযথ ভাবে অনুধাবন করে জাতি গঠনের কাজে তার প্রয়োগ করেছে। তাই আজ সঙ্ঘের প্রতিটি শাখায়, শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে রক্ষাবন্ধন পালিত হয় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা পবিত্রতার সঙ্গেই। ওই দিনটি শাখায় শাখায় স্বয়ংসেবকরা 'সর্বোচ্চ সংখ্যা দিবস' হিসেবে খুব উৎসাহের সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাই রক্ষাবন্ধন নিছকই এক উৎসব নয়, একতার বন্ধন হিসেবে সমাজে পুনঃস্থাপিত হয়েছে। আজ সমস্ত স্কুল-কলেজ, ক্লাব ইত্যাদি স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত রক্ষাবন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে। জনমানসে রক্ষা বন্ধনের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমস্ত ভারতবাসী আজ এই দিনটিতে রাষ্ট্রীয় ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে সামাজিক সংহতি রক্ষা কামনায় এক সংকল্প সূত্রে আবদ্ধ হন। এই এক সূত্রতার জোরেই দেশমাতৃকাকে পরম বৈভবশালী করার লক্ষ্য প্রাপ্তির পথ আরও সুগম হবে, এটি আমাদের একমাত্র স্বপ্ন। □

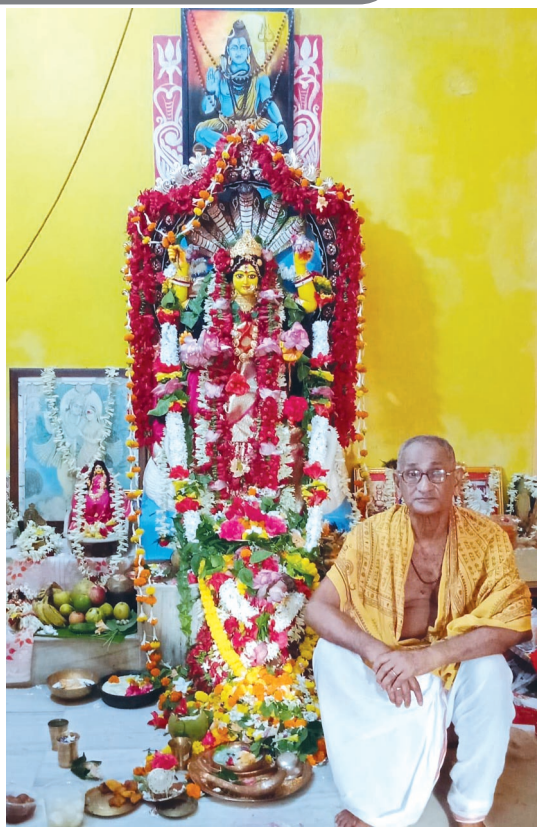

সোদপুরের চক্রবর্তী পরিবারের সুপ্রাচীন মনসাপূজা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ বঙ্গদেশের সুপরিচিত গ্রন্থ। যখন জয়দেব- বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কলকাকলিতে বঙ্গপ্রদেশ মুখরিত, তখন কবি বিজয় গুপ্ত ভক্তিভরা ব্যাকুল কণ্ঠে দেবী মনসার পূজা প্রচার কাহিনি বর্ণনা করে পূর্ববঙ্গে প্লাবিত করেন। মা-মনসা নতুন দেবী নন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসে সর্প পূজার রীতি প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা আকারে এই পুজো হয়ে আসছে। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম-ভক্তির প্লাবন আনয়ন করেন, তখনও বঙ্গের প্রায় সর্বত্র মনসা, পদ্মাবতী বা বিষহরী পূজার প্রচলন ছিল। স্মার্ত ও পৌরাণিকরা সংস্কৃত মন্ত্র দ্বারা দেবী মনসার পূজাপদ্ধতি সংহিতাবদ্ধ করলেও বৌদ্ধদের অনুকরণে দেবতার লীলাকাহিনি জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রচলিত ভাষায় গাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এইভাবেই মঙ্গল গীতের উৎপত্তি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভারতের আদি পর্ব ও ভবিষ্যপুরাণে নাগমাতা মনসার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মনসামঙ্গল (পদ্মা পুরাণ) একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ চণ্ডী, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃতের মতো ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও বর্ধমানের প্রাচীন স্থানে অতিমান্য ও সমাদৃত। এই পুস্তক তালপাতা ও তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ করে ভক্তকুল একত্রে তা পাঠ ও শ্রবণ করতেন। গ্রন্থখানি দেবলীলাখ্যান পরিপূর্ণ গীতিকাব্য। হিন্দুরা মঙ্গল কামনায় মানসিক করে গান গেয়ে থাকেন। শ্রাবণ মাসের ১ তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত এক মাসকাল অনেক হিন্দুর বাড়িতে মনসামঙ্গল পাঠ হয়ে থাকে। অনেক জায়গায় এই গ্রন্থ বিগ্রহের মতো অর্চিত হয়।

কথিত আছে, দেবীর আদেশ অনুসারে কবি বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বিজয় গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। মহাত্মা বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর কৃপায় তাঁর পাঁচালি লিখতে আর্দিষ্ট হয়ে পীঠস্থানস্থিত প্রকাণ্ড ছাতিম গাছের তলায় বসে পাঁচালি প্রস্তুত করেন। পাঁচালি লেখা হলে কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জী টীকাকার মাতুল ত্রিলোচন দাস কবীন্দ্রকে সংশোধন করতে দিয়েছিলেন। ত্রিলোচন দাস পাঁচালি সংশোধন আরম্ভ করলে, তাঁদের পুরোহিত গৈলাস্থিত ডিংসাই বংশের আদি পুরুষ রামটুরি চক্রবর্তীর এক কন্যা এসে কবীন্দ্র কী করছেন তা জিজ্ঞাসা করলেন। কবীন্দ্র উত্তর দিলেন— 'বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালি সংশোধন করিতেছি।' কন্যা বললেন, 'উগা বিজয় গুপ্ত যাহা করিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়াছে; আপনার আর হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।' এই কথা বলে বালিকা বাড়ির মধ্যে চলে এলেন। তথাকথিত অশিক্ষিতা কন্যার এই রকম কথাবার্তা শুনে কবীন্দ্র মনে মনে ভাবলেন এবং কারণ জানার জন্য তাকে ডাকলেন। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানে জানলেন যে, পুরোহিতের একমাত্র কন্যা ৪-৫ মাস হলো তার শ্বশুরালয় গেছে। ত্রিলোচন দাস বুঝলেন যে এ সমস্তই দেবীমনসার কাজ। তাই তিনি ভীত হয়ে পাঁচালি সংশোধনে বিরত হলেন এবং এটাই অতি উৎকৃষ্ট হয়েছে বলে বিজয় গুপ্তকে প্রত্যার্পণ করলেন। কবি বিজয় গুপ্ত ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের সমসাময়িক। তাই ১৪৯৪ থেকে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মনসামঙ্গল রচিত হয় বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

বিজয় গুপ্তের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলাফুল্লশ্রী, অন্য নাম মানসী। মনসা কল্পিত স্থান বলে এর নাম মানসী হয়েছে। ভগবান শিবের কাশী, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের মতো মানসীও দেবী মনসার প্রিয় স্থান। এখনে দেবীর ঘট স্থাপিত থাকে। বণিকেরা ইষ্ট সাধন মানসে সেখানে পুজো দিতেন। বিষহরীর পূজা প্রচারার্থে তাঁর সহচরী শিবের কন্যা নেতা তাঁকে সেই স্থানে আনেন। এই স্থান দেবীর মনোজ্ঞ এবং এখান থেকেই তাঁর পূজার প্রচার হয়। এই প্রাচীন জনপদটি অন্যান্য তীর্থের মতো 'মনসা তীর্থ' বলে পরিচিত। বহু শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থান বহু লোক পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচীন মানসী, ফুল্লশ্রী ও গৈলা এক পর্যায়বাচক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বসতি ছিল বলে ইতিহাসের নানা সূত্রে জানা যায় এবং এই স্থান 'পণ্ডিত নগর' বলে বিখ্যাত ছিল।

ত্রিলোচন দাস কবীন্দ্র, জানকীনাথ দাস, কবিকণ্ঠহার, ভবানীনাথ দাস সার্বভৌম প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই স্থানের নাম পণ্ডিত নগর হওয়া যথার্থ। বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও গৈলা বাখরগঞ্জের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। এখানে 'কবিসাগর', 'কবীন্দ্রের পাড়', এবং 'রাজপণ্ডিতের বাড়ি' নামে কয়েকটি প্রাচীন স্থান আছে।

মনসালয় এবং কবির বসতবাড়ি :

এই বাড়িটি অত্যন্ত প্রাচীন। বিজয় গুপ্তের মনসাবাড়ি বলে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত। এখানে পদ্ম ফুলে সুশোভিত এক প্রাচীন সরোবর ছিল। সরোবরের পূর্ব তীরে মনসা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত সাধক গুরুপ্রসাদ দাসের আমলে আনুমানিক বাংলা ১২৫৪ সনে এই মন্দির প্রথম নির্মিত হয়। ওই মহাত্মার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামচন্দ্রদাস ওই মন্দির পুনঃসংস্কার করেন। মনসা দেবীর মূর্তি মৃত্তিকা নির্মিত ছিল। পরবর্তীকালে নীলকমল দাস একটি পিতলের মূর্তি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এই দেবী বিজয় গুপ্তের আরাধ্যা এবং তাঁর দ্বারা সংস্থাপিতা বলে এখনও প্রসিদ্ধ। প্রায় ৫০০ বছর হয়ে গেছে কিন্তু ভক্ত বিজয় গুপ্তের কীর্তির বিন্দুমাত্র হানি হয়নি। এখনও বিজয় গুপ্তের স্থাপিতা মনসাদেবী প্রত্যক্ষ দেবী বলে ভক্তির সঙ্গে পূজিতা হয়ে থাকেন। বিভিন্ন স্থান হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ নানা রোগমুক্তি বা শ্রীবৃদ্ধি কামনায় এই স্থানে মনসাদেবীর পূজায় সমাগত হয়ে থাকেন। এই উপলক্ষ্যে বহু লোকের সমাগম হয় এবং তখন সরোবরের ওপর তিন পাড়ে মেলা বসে। দেবী মনসার ঘট দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত বলে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি অনুযায়ী স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ওই ঘট মর্ত্যে নিয়ে আসেন। লাটিক নামক এক চণ্ডাল ওই ঘট পান। তাঁর বংশধরদের বিষহরীর সন্তান বলা হয়। মনসালয়ের অনতিদূরে তাদের বসতি আছে। কালক্রমে ওই ঘট মনসাকুণ্ডে অন্তর্হিত হয়। কথিত, কিছুদিন পরে গাই গোবর্ধন আচার্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এখানে পূজার্চনা করেছিলেন, তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন। এর কিছুদিন পরে বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী ইচ্ছাপুরা গ্রাম নিবাসী, পরবর্তীকালে গৈলা নিবাসী বঙ্গবাস ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এখানে দেবী মনসার অর্চনা করেন।

এরপর বিজয় গুপ্ত আবির্ভূত হন। বিজয় গুপ্তের তিরোধানের পর ওই ঘট আবার কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। পরবর্তী লোকেরা পীঠস্থানে ঘট স্থাপন করে পুজো দিতেন। বিজয় গুপ্তের প্রায় ২০০ বছর পরে ভবদাস বংশোদ্ভূত প্রসিদ্ধ রায় কাশীনাথ দাস মজুমদারের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর দাস দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। ওই সময়ে ডিংসাই বংশোদ্ভূত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী (রামটুরি চক্রবর্তীর বংশের উত্তর পুরুষ), দুই সেন বংশোদ্ভূত সদাশিব সেন ও শিকারপুর নিবাসী কমলকৃষ্ণ তর্কভূষণ— এই তিনজন এক সময়ে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণকিঙ্কর দাসকে জ্ঞাপন করেন এবং কালীশঙ্কর চক্রবর্তী কুণ্ডে অবতরণ করে ঘট উত্তোলন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর দাস ওই ঘট স্থাপন এবং অর্চনা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। তখন থেকে ওই ঘট অর্চিত হয়ে আসছে। এরপর ১৭৯০ শকাব্দে মহাত্মা গুরুপ্রসাদ আবির্ভূত হন। দেবী মনসার কৃপায় ইনি দুরারোগ্য ক্ষত রোগ হতে মুক্ত হয়ে বাকসিদ্ধ হয়েছিলেন। দেবী মনসার আদেশে প্রতিদিন নানারকম দুরারোগ্য রোগের ওষুধ দিতেন। তাঁর ওষুধে অনেকেই আরোগ্য লাভ করেছিলেন। দেবী মনসার কুণ্ডের অনতিদূরে দক্ষিণ পাড়ের পশ্চিমাংশে বিজয় গুপ্তের বসতবাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান।

দেশভাগের পরবর্তীকালে ইংরেজি ১৯৪৭ সালের পরবর্তী পর্যায়ে ডিংসাই বংশোদ্ভূত রামটুরি চক্রবর্তী বংশের অষ্টম পুরুষ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং তাঁর খুড়তুতো ভাই সুরেন চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। বৌবাজারে শশীভূষণ দে স্ট্রিটে এবং পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়ায় তাঁরা বসবাস শুরু করেন। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী পেশায় ছিলেন বসুমতী পত্রিকার কর্মী। বৌবাজার ও কাঁচরাপাড়ায় অবস্থানকালে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শিশুবালা দেবী এবং তাঁর ভাই সুরেন চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গের মতোই সব আচারাদি অনুসরণ করে দেবী মনসার পূজা পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীমতী শিশুবালা দেবীর ৩ জন পুত্র সন্তান বর্তমান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, নকুলেশ্বর চক্রবর্তী এবং সর্বেশ্বর চক্রবর্তী। ইংরেজি ১৯৬২ সালে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সন্তান এবং রামটুরি চক্রবর্তীর বংশের নবম পুরুষ সর্বেশ্বর চক্রবর্তী অধুনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটী পৌর এলাকার অন্তর্গত সোদপুরের মহেন্দ্র নগর অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। ওই বছরের ২০ ফাল্গুন সর্বেশ্বর চক্রবর্তী মহেন্দ্রনগরে তাঁর বাসগৃহে (বাড়ির নাম মনসালয়) দেবী মনসার মন্দির স্থাপন করেন। সেই থেকে এই ২০২৩ সাল অবধি প্রতি বছরে ২০ ফাল্গুন দেবী মনসার মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দেবী মনসার পূর্জার্চনা এবং গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে মনসা মঙ্গল পাঠ, বিভিন্ন ভক্ত পরিবারের মঙ্গল কামনায় মানসিক ব্রত করে মনসামঙ্গল গীতিকাব্য গীত হয়ে থাকে। চলিত ভাষায় ওই গানকে 'রয়ানী' বলে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে দেবী মনসার বিশেষ পূজার আয়োজন হয়ে থাকে। এই পূজা উপলক্ষ্যে সর্বেশ্বরবাবুর বাসগৃহ মনসালয়ে বহু ভক্তের সমাগত হয়ে থাকে এবং তাঁর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন। দেবীর পূজার পৌরোহিত্য করেন সর্বেশ্বরবাবু স্বয়ং। তাঁর বয়স বর্তমানে ৭৮ বছর। ১৮ আগস্ট, ২০২৩ (৩২ শ্রাবণ, ১৪৩০)। শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে মহেন্দ্রনগরে তাঁর ওই নিবাসে দেবী মনসার যথাবিধ পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয় এবং কবি বিজয় গুপ্তের বংশধররা এই বছরে এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন এবং দেবীর পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় ভক্তদের কাছে সর্বেশ্বর চক্রবর্তী বাড়ির মন্দিরে স্থাপিতা দেবী মনসা সদাজাগ্রত। দেবী মনসার একনিষ্ঠ ভক্ত সর্বেশ্বরবাবু উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে সপরিবারে পূজা এবং সন্ধ্যারতির শেষে দেবীর কাছে সমগ্র জগৎ এবং মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা করেন। □

শতবর্ষের প্রাক্কালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিভ্রম

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপনের ঠিক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘোষণা করলেন তাদের স্নাতক স্তরের মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট পেপারটি থেকে ইকবালের রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে। ইকবালের যে নবমূল্যায়ন করা হয়েছে তারই ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত।

পকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা মোহম্মদ ইকবালের মূল্যায়ন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে করা হয়েছে তা বোঝা গেল না। ইকবাল তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আল্লমা বা মহাপণ্ডিত উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর রচনার অধিকাংশই উর্দুতে এবং কিছু ফার্সিতেও আছে। ভাষা ও লিপির অন্তরায়ের জন্য সর্বভারতীয় সমাজে ইকবালের রচনাবলী সুপরিচিত হতে পারেনি। তবু তাঁর রচনা যে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনি যে নিজেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন সে সত্য তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন রচনায় বহুভাবে সে কথা তিনি প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তারই নির্বাচিত কবিতা তিনি বাং-ই-দারা নামক কবিতার বইয়ে মৃত্যুর আট বছর আগে সংকলিত করে গেছেন। দেশে বিদেশে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর মন সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিবেচনা করেছিল সেই কবিতাগুলিই তাঁর সেই সংকলনে স্থান পায়। সেই বইয়েরই এক গীতিকবিতা তরানা-এ-হিন্দী বা ভারতীয় গান। সেই গানের প্রথম কয়েক কলির সঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয়ই পরিচিত। সেই গানের ‘সারে জঁহাসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা’র সুর বাজে সামরিক কুচকাওয়াজেও। গানের কয়েক কলি গাওয়া হয় বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে। সেই বইয়েরই অন্য এক গীতিকবিতা তরানা-এ- মিল্লী বা স্বজাতীয়ের

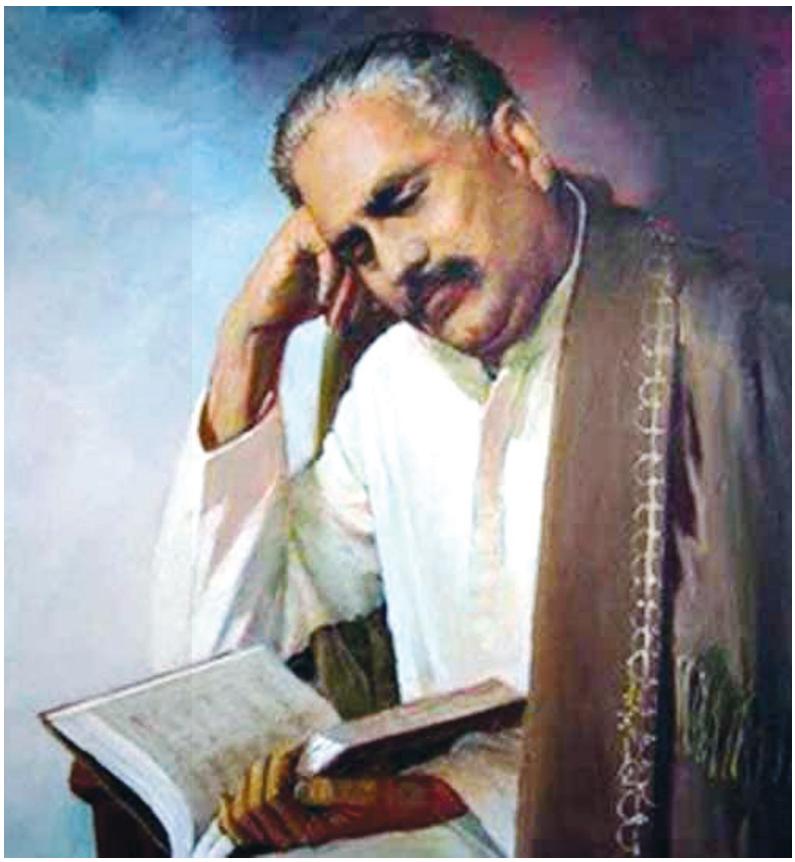

গান। ইকবালকে চেনার বা বোঝার জন্য দুটি গীতিকবিতাই যথেষ্ট।

তরানা-এ-হিন্দীর প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছাড়া আঠারো পঙ্‌ক্তির এই গীতিকবিতার অধিকাংশই উর্দু লিপির সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা অপরিচিত থেকে যান। তরানা-এ-মিল্লী আরও বেশিভাবে জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। আরও একটি সত্য এই যে উর্দুভাষীদেরও এক বিরাট সংখ্যক মানুষ চান না ইকবালের রচনার সঙ্গে সর্বভারতীয় জনসমুদায় পরিচিত হোক। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৪ সালে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে নানা পুস্তিকার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক দেওয়া একটি কাগজে উর্দুতে লেখা ইকবালের তরানা-এ-হিন্দী গানটিও দেওয়া হয়েছিল। সেখালে আঠারো পঙ্‌ক্তির তরানা-এ হিন্দী থেকে ছ’টি পঙ্‌ক্তি বা তিনটি স্তবক বাদ দিয়ে ছেপে তারা বিজ্ঞান কংগ্রেসের ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের সেটি দিয়েছিল। যে তিনটি স্তবক তারা বাদ দিয়েছিল শুধু সেগুলির পর্যালোচনা করলেই ইকবালের প্রকৃত পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যায়।

সেই তিনটি স্তবকের একটিতে অর্থাৎ তরানা-এ-হিন্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলেছেন, আমরা যখন বিদেশে থাকি

আমাদের মন পড়ে থাকে স্বদেশে। বুঝে নাও আমি সেখানেই আছি যেখানে আমার হৃদয় আছে— 'গুরবত মেঁ (পরদেশে) হো অগর হম, রহতা হ্যায় দিল রহী বতন মেঁ। সমঝৌ বঁহী হমেঁ ভী দিল হো জঁহা হমারা।' ইকবাল বহু চেষ্টা করেও হৃদয়ের সেই আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারেননি। তংার অন্তর্জগতের এই একাত্মতাকে বহির্জগৎ স্বীকৃতি দেয়নি।

সেই গীতিকবিতার নবম ও দশম পঙ্‌ক্তি গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সেখানে তিনি বলেছেন— 'হে পুণ্যতোয়া গঙ্গা, সেই দিনটির কথা কি তোমার মনে আছে যেদিন তোমার তীরে আমরা সদলে নেমেছিলাম?— 'এ-আব-এ-রুদা-এ গঙ্গা! বো দিন হ্যায় য়াদ তুঝকো। উতরা তেরে কিনারে, জব কারবাঁ হমারা?' এই সদলে গঙ্গাস্নানের কথা ইকবাল কেন লিখেছিলেন? রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের তারাই-বা কেন সেকথা জনসমক্ষে আনতে চাননি? ইকবালকে বুঝতে এই স্তবকটিও গুরুত্বপূর্ণ।

তরানা-এ-হিন্দীর শেষ স্তবকটিও অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। সেখানে ইকবাল নিজেকে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'ইকবাল! কোই মরহম, অপনা নহীঁ জঁহা মেঁ। মালুম ক্যা কিসি কো দর্দ-এ-নিহাঁ হমারা।' এই দুই পঙ্‌ক্তির অর্থ হলো, ইকবাল! এই দুনিয়ায় (জহাঁ মেঁ) তোমার কোনো মর্মজ্ঞ (মরহম) নেই। কেই-বা জানে আমার অন্তরের গুপ্ত বেদনা (দর্দ-এ-নিহাঁ)। এইভাবে তিনি ভারতীয়ের গান শেষ করেন।

আরও একটি গান তাঁর বাং-ই-দারা সংকলনে আছে। তরানা-ই- মিল্লী অথবা স্বজাতীয়ের গান। সেখানে তিনি স্বজাতীয়দের পরিচয়ে লিখেছেন, 'তেগোঁ কে সায়ে মেঁ হম, পল কর জবাঁ হুয়ে হ্যাঁয়। খঞ্জর হিলাল কা হ্যায় কৌমী নিশাঁ হমারা।' এর তর্জমা করলে দাঁড়ায়, তরবারির ছায়ায় (তেগোঁ কে সায়ে মেঁ) আমরা পালিত হয়ে যৌবন লাভ করেছি। কিরীচাকৃতির বালচন্দ্র (খঞ্জর হিলাল) আমাদের জাতির প্রতীক (কৌমী নিশান)।

সোমনাথের অনুগামী ইকবাল জানতেন, কলঙ্ক স্পর্শ না করা যে দ্বিতীয়ার চাঁদ, সোমনাথের শিরোভূষণ সেই চাঁদই তাঁর স্বজাতীয়দের কৌমী নিশান হয়েছে। সেই গীতিকায় তিনি দজলা নদীর কথা লিখেছেন। আরও লিখেছেন পবিত্র সেই 'তাঁর' কথা, যাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের জন্য তাঁরা কেটে মরেছেন (এ অর্জে পাক! তেরি হুর্মত পে কট মরে হম)। তিনি সেই কবিতায় তাঁর স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু লিখেছেন কিন্তু কোথাও তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেননি।

ইকবালের কাব্যগ্রন্থ বাং-এ-দারায় শ্রীরামকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা আছে। সেখানে রামের স্তুতিতে তিনি লিখেছেন— 'হ্যায় রামকে ওয়াজুদ পে হিন্দোস্তাঁ কো নাজ। অহল-এ-নজর সমঝতে হ্যাঁয় ইসকো ইমাম-এ-হিন্দ।' যার অর্থ দাঁড়ায়, রামের অস্তিত্বের সঙ্গে হিন্দুস্থানের গর্ব জড়িয়ে আছে। স্বচ্ছ দৃষ্টির (অহল-এ- নজর) লোকেরা তাঁকে 'ইমাম-এ-হিন্দ্' বা হিন্দুস্থানের নেতা বলে মনে করেন। সেই কবিতায় আরও লেখা রয়েছে, রাম ছিলেন বীরত্বে, পবিত্রতায় ও ভালোবাসায় অদ্বিতীয়। ---'সুজাত মেঁ, পাকিজগী মেঁ। জোশ এ মুহবত মেঁ ফর্দ থা।' এভাবেই অন্যান্য কবিতায় তিনি গুরু নানকের, গৌতম বুদ্ধের প্রশস্তি করেছেন। দেশের প্রশস্তি করে তাঁর নয়া শিবালহ্ বা নব শিবালয় কবিতায় ভারতবর্ষের প্রতিটির ধূলিকণার পবিত্রতার কথা বলেছেন। তাঁর এইসব রচনাকে লিপ্যান্তর বা অনুবাদের মাধ্যমে ভারতের সকল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করানো দরকার। তাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খাপছাড়া সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

ইকবালকে পাকিস্তানের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। ১৯৩০ সালে বাং-এ-দারা প্রকাশিত হওয়ার বছরেই তিনি এক জনসভায় বলেছিলেন ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি রাজ্য থাকলে ভালো হয়। সেখানে স্বাধীন কোনো পৃথক দেশের চিন্তা ছিল না। তাঁর জাগ্রত মন ভারতভূমি থেকে নিজেকে বা সমুদায় মুসলমান সম্প্রদায়কে কখনোই বিচ্ছিন্ন করতে চাননি।

বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে বারবার ভিন্ন ভিন্নভাবে তিনি এই দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের একাত্মতার কথা প্রকাশ করে গিয়েছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত, ইকবাল ও তাঁর লেখা বহিষ্কার না করে ইকবালের অন্তরে যে অব্যক্ত দুঃখ (দর্দ-ই-নিহাঁ) ছিল এবং যা বর্তমানেও অনেকের অন্তরে আছে তার মর্যাদাপূর্ণ পথে দূর করার ব্যবস্থা করা। সেই সঙ্গেই প্রয়োজন ভারতভাগের চিন্তা কার কার মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল এবং তাতে ইন্ধনই-বা কারা জুগিয়েছিলেন তা অনুসন্ধান করে প্রমাণ-সহ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

(লেখিকা কলকাতা যোগমায়া কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

আগামী চার বছরেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে ভারত

তারক সাহা

দেশকে বৈভবশালী করতে বদ্ধপরিকর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এমন এক সংকল্প করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি রাজস্থানে এক জনসভায় তিনি বললেন, জনগণ যদি তাঁর সরকারকে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন করে তবে আগামী ২০২৭ সালে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য হবে। এটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। এক সময় এদেশে দুই শতাধিককাল শাসন করা দেশ অর্থনীতিতে ভারত থেকে পিছিয়ে। ব্রিটিশকে পিছনে ফেলে ভারত আজ পঞ্চম শক্তিধর দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। ভারত এখন তিন ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশ। আজ থেকে ঠিক নয় বছর আগে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অর্থনীতিতে ভারতের স্থান ছিল দশমে এবং দুই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ছিল দেশের।

চোখে স্বপ্ন, কিন্তু সেই স্বপ্ন রূপায়নে দেশের সার্বিক সামর্থ্য কতটা? এখন দেশের সাফল্য আসবে তখনই যখন সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নত থেকে উন্নততর হবে। সবক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের মাপকাঠি দিয়েই নির্ধারিত হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার।

ভারতের জিডিপির উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। ২০১৪ সালে মাথাপিছু জিডিপির হার বিশ্বের দশটি অর্থনৈতিক দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল সর্বনিম্ন। সেই সময়ে একজন ভারতীয়র থেকে ৩৫ গুণ বা ৫৫০৮৪ ডলার এবং তুলনায় একজন জার্মানির ৩১ গুণ, একজন ব্রিটেনবাসীর ৩০ গুণ এবং গড়ে একজন ফরাসি, জাপানি ও ইতালীয়র গড়পড়তা আয় একজন ভারতীয়ের তুলনায় ২০ গুণ। এমনকী প্রতিবেশী চীনেরও গড়পড়তা বার্ষিক আয় ভারতীয়দের তুলনায় অন্তত পাঁচ গুণ বেশি। কিন্তু এই জিডিপির গড়পড়তা আয় বৃদ্ধি দুনিয়ার সমৃদ্ধিশালী দেশগুলোর সমকক্ষ হতে পারবে আজ থেকে চার বছর বাদে ২০২৭ সালের মধ্যে।

২০২৭ সালের মধ্যে তা সম্ভব করতে গেলে সরকারকে পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে সড়ক নির্মাণ, রেল পরিষেবার প্রসার, নতুন বিমানবন্দর ও সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ, অচিরাচরিত বিদ্যুতের দেশজুড়ে প্রসার বৃদ্ধির প্রতি সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বাজেটে ইত্যাদি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি অনেকটাই বেড়েছে বিগত কয়েক বছরে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দৌড়ের প্রতিযোগিতায় শামিল হতে হলে বর্তমানে চতুর্থ স্থানে থাকা জার্মানিকে টপকাতে হবে। বর্তমান জার্মানির অর্থনীতিতে মন্দা চলছে। এই অবস্থা আগামী চার বছর বহাল থাকলে তাকে টপকানো সহজ হবে। যদি জার্মানিকে টপকাতে পারে তবে সামনে রইল জাপান। ২০২২ সালে দেশটি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা আগামী চার বছরে স্থিতির বিশেষ হের ফের হবে না। ধনী দেশ কিন্তু গরিব নাগরিক হিসেবে জিডিপির বা গড় জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে কয়েটি দেশের অবস্থান (মার্কিন ডলারের নিরিখে) এবং ২০১৪ সালে দেশ মাথাপিছু বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল :

কেনিয়া ১৬১১, ক্যামেরুন ১৬০৫, ইয়েমেন ১৫৮০, **ভারত ১৫০৫**, পাকিস্তান ১৪২৮, জিম্বাবুয়ে ১৪১৫।

২০২৭-এ কয়েকটি দেশের আর্থিক অবস্থা কীরকম হতে পারে তাদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় উৎপাদন : বাংলাদেশ ৩৭৪৮, গাজা উপকূল ৩৭২৮, ভানুয়াতু ৩৫৯৩, **ভারত ৩৪৬৬**, অ্যাঙ্গোলা ৩৪৬৬, নাইজেরিয়া ৩২৮৮।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান মাথাপিছু বার্ষিক গড় উৎপাদনের নিরিখে ২০১৭-এর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে আগে রয়েছে বেশ কিছু ছোটো দেশ। লোকবল ও আয়তনে এই দেশগুলো বেশ পিছিয়ে থাকলেও মাথাপিছু বার্ষিক গড় উৎপাদনে এরা অনেক আগে।

এতকিছু সত্ত্বেও ভারত কদম কদম এগিয়ে চলেছে আর্থিক উন্নতির দিকে। একসময় ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। একসময় আমেরিকার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে কবে পিএল ৪০ স্কিমে গম আসবে তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে হয়েছে। আর আজ বিশ্বের অন্যতম খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। সামগ্রিক ভাবে ৪০ শতাংশ চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে বিশ্বে। জাম্বিয়া, আবুধাবিতে আইআইটি— এসব দেশে কারিগরি শিক্ষাকে উন্নত করতে শাখা খুলছে। আগে একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে টাকায় বাণিজ্য হতো, এখন টাকায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে ইউই-তে, শ্রীলঙ্কা-সহ আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন হবে ভারতীয় মুদ্রায় এবং এতে যেমন মহার্ঘ ডলার বাঁচাতে পারা যাবে। তেমনি আমদানি বাণিজ্যে দরকষাকষির স্থান তৈরি হবে। সার্বিকভাবে ২০২৪ সালে তৃতীয় বারের জন্য মোদী সরকার ক্ষমতায় এলে ভারত আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী হবে এবং জগৎসভায় নিজের অবস্থান আরও মজবুত হবে। □

মেহুলির অলিম্পিকের ছাড়পত্র

নিলয় সামন্ত

বয়স কম, সাফল্য বেশি। পশ্চিমবঙ্গের শুটার মেহুলি ঘোষ। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী কথাটা মেহুলিকে দেখলে কথাটা মাথায় আসতে বাধ্য। ঝুলিতে কমনওয়েলথ গেমস, বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ, দক্ষিণ এশীয় গেমসের পর শুটিং বিশ্বকাপে পদক জয়। হুগলির ২১ বছরের এই কন্যাতেই লুকিয়ে বাঙ্গালির অলিম্পিকসের মঞ্চ থেকে পদক জয়ের স্বপ্ন।

ছোটো থেকে বন্দুক, রাইফেল চালনার দিকে ঝোঁক। মেলায় গিয়ে বেলুন ফাটনোর স্টল যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। বেলুন ফাটিয়ে মেহুলির পুরস্কার ছিল বাঁধা। জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালে সিআইডির ফ্যান মেহুলি। বন্দুক হাতে দয়া, অভিজিৎদের কেরামতি দেখে অনুপ্রাণিত হন। ২০১৪ সালে শ্রীরামপুর রাইফেলস ক্লাবে যোগ মেহুলির। একদি অনুশীলনের সময় ঘটে যায় দুর্ঘটনা। অনুশীলন করতে গিয়ে তাঁর ছোড়া গুলি গিয়ে লাগে এক ব্যক্তির গায়ে। জখম হন ওই ব্যক্তি। অ্যাকাডেমিতে নিষিদ্ধ হয়ে যায় বাঙ্গলার শুটার। ওই ঘটনা ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। বিধ্বস্ত মেহুলি দ্বারস্থ হন অর্জুন পুরস্কারজয়ী অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। জয়দীপের কোচিঙে জীবন বদলে যায় বৈদ্যবাটীর মেয়েটির। অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল। কোচ কাম মেন্টর জয়দীপ কর্মকার তাঁর চতুর্থ হওয়ার যন্ত্রণা মেটাতে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন মেহুলিকে। জয়দীপের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এককাট্টা বাঙ্গালি শুটারও।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে একটি সোনা ও ব্রোঞ্জ পদক জিতে ২০২৪-এর অলিম্বিকের ছাড়পত্র সংগ্রহ করলেন এ রাজ্যের এই শুটার। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জেতেন জয়দীপ কর্মকারের ছাত্রী। ফাইনালে ২২৯.৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় হন। অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করার পর একটি ভিডিয়ো বার্তায় মেহুলি বলেন, 'বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতার পাশাপাশি অলিম্পিকের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পেরে দারুণ লাগছে। আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য জাতীয় রাইফেল সংস্থা, সাই এবং বাকিদের ধন্যবাদ। আরও পদক জিতে দেশকে গর্বিত করার চেষ্টা করব।' পদক জিতে প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করলেও এ রাজ্যের শুটারের অংশগ্রহণ নির্ভর করবে জাতীয় অলিম্পিক কমিটির ওপর। তবে তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আন্তর্জাতিক স্তরে লাগাতার সাফল্যের ইতিহাস দেখে ধরে নেওয়া যায়। মেহুলিকে প্যারিস অলিম্পিকে দেখা যাবে। তাঁর এই সাফল্যে খুশি অভিনব বিন্দ্রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেহুলিকে শুভেচ্ছা জানান অলিম্পিকে ভারতের একমাত্র সোনাজয়ী শুটার। এদিন চতুর্থ স্থানে শেষ করে বাঙ্গলার আরেক শুটার তিলোত্তমা সেন। দলগত বিভাগেও সোনা জেতে ভারত। কিন্তু অলিম্পিকের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট বিভাগে একটি দেশ থেকে মাত্র একটি কোটা।

প্যারিসে অলিম্পিকের আসর বসছে আগামী বছর। আর সেখানেই পদকের লক্ষ্যে শুটিং রেঞ্জে নামবেন হুগলির বৈদ্যবাটির মেয়ে মেহুলি ঘোষ। আজারবাইজানের বাকুতে বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতলেন মেহুলি। এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই জয়দীপ কর্মকারের ছাত্রী পেয়ে গেলেন অলিম্পিক গেমসে নামার ছাড় পত্র। নিশ্চিতভাবেই যা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে খুশির খবর।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দলগত বিভাগে ২২ বছরের মেহুলির সঙ্গেই অংশ নিয়েছিলেন তিলোত্তমা সেন ও রমিতা। ১৮৯৫.৯ কম্বাইন্ড স্কোরের মাধ্যমে মেহুলিরা ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দলগত খেতাব জেতেন। চীন রুপো পেয়েছে ১৮৯৩.৭ স্কোর করায়। ব্রোঞ্জ জিতেছে জার্মানি। অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত বিভাগে। মেহুলি ফাইনালে ২২৯.৮ স্কোর করে পোডিয়াম ফিনিশ নিশ্চিত করেন। চীনের জিয়াইউ হান ২৫১.৪ ও ঝিলিন ওয়াং ২৫০.২ স্কোর করেন। এয়ার রাইফেলে এই তিন শুটারই পেলেন অলিম্পিক শুটিঙে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র।

পুরুষদের শুটিঙে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুদ্রাক্ষ পাতিল, ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনসে স্বপ্নিল কুশালে ও ট্র্যাপে ভাওনীশ মেন্ডিরাট্টা ইতিমধ্যেই অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন। মেহুলি ব্রোঞ্জ জিতলেন বছর ১৫-র তিলোত্তমা সেনকে হারিয়ে। তিলোত্তমা চতুর্থ স্থান দখল করলেন ২০৮.৪ স্কোর করে। মেডেল রাউন্ডে যেতে না পারলেও তাঁর পারফরম্যান্স প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ১৪০ জন শুটারের মধ্যে মেহুলি ৬৩৪.৫ স্কোর করে শীর্ষে ছিলেন। সোনা জেতা হান ছিলেন তৃতীয় স্থানে (৬৩২.৩) ও রুপোজয়ী ওয়াং ছিলেন আটে (৬৩০.৮)। মেহুলি বলেন, ব্রোঞ্জ জিতে এবং অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়ে ভালো লাগছে। সাই, ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া, টপসের সহযোগিতা পেয়েছি, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আগামী দিনে দেশের জন্য আরও পদক জিতে সকলকে গর্বিত করাই লক্ষ্য মেহলির। তিনি বলেন, ফাইনালের আগে খুবই উত্তেজিত ছিলাম এবং নার্ভাস লাগছিল। পদক জেতার পরেও নার্ভাস লাগছে। আমাদের মধ্যে ফারাক খুব কম ছিল। ফলে যেভাবে পারফর্ম করেছি তাতে সামগ্রিক ফলাফলে খুশি। □

ড্রাগন ফলের চাষ স্বনির্ভরতার চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তরপ্রদেশের বেরিলির মহিলা পট্টি গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক যশপাল বিপদকে জয় করার পন্থা আবিষ্কার করে রোহিলখণ্ড অঞ্চলের কৃষক সমাজের সামনে আর্থিক স্বনির্ভরতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমবিএ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করতেন। কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে চাকরিহীন হয়ে পড়লে গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা ও কৃষি-প্রযুক্তি সহযোগে তিনি কৃষিকাজে অগ্রসর হন। কঠোর পরিশ্রমে এক বছরে চাকরিরত অবস্থা অপেক্ষা বহু গুণ বেশি অর্থ উপার্জন করে স্থানীয় কৃষক সমাজের কাছে যশপাল আজ প্রেরণার এক উৎস।

বেরিলিতে ড্রাগন ফ্রুটের (ফলের) সর্বপ্রথম উৎপাদক হলেন যশপাল। কোভিড পরিস্থিতি চলাকালীন ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনার কারণে তিনি আহত হন। দীর্ঘ দিন তাঁর চিকিৎসা হয়। চাকরিতে যোগ দিতে না পারার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে তাঁর বাবা, ভাই সবাই চাকরিজীবী। দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে ফিরে, পরে সুস্থ হয়ে যশপাল কৃষিকাজে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যদিও তাঁর পরিবার তাঁকে চাকরিতে যোগদানের পরামর্শ দেয়। কিন্তু তিনি তাঁকে সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণে আত্মীয় স্বজনরাও সম্মতি দিলেন।

যশপালের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ একর, যেখানে গম, আখ ইত্যাদি ফসলের চাষ হতো। কিন্তু নীচু জমি হওয়ার কারণে বর্ষাকালে জমি জলে ডুবে যেত। এর ফলে ক্ষেতের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই কারণে ক্ষেতের একটা অংশকে তিনি উঁচু জমিতে পরিণত করলেন এবং সেই জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করলেন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে উন্নত মানের কৃষিকাজের বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর হরিয়ানার পানিপথে গিয়ে ড্রাগন ফ্রুট চাষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

একবারে শুরুতে তিনি তাঁর জমিতে ৪৮টি ড্রাগন ফ্রুটের চারা রোপণ করেন। শীতকালে ছত্রাকের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা প্রবল ছিল, তাই প্রতিদিন প্রতিটি সদ্যরোপিত চারাগাছের যত্ন ও পরিচর্যার কাজ তিনি একটানা করে যান। এর ফলে ৪৮টি গাছই বেঁচে যায় ও সুস্থ থাকে। ফলস্বরূপ পরবর্তী ১৫ মাসে এই ৪৮টি গাছ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম ড্রাগন ফ্রুট সংগৃহীত

হয়েছে। প্রতি কেজির দাম ৪৫০-৫০০ টাকা হিসেবে এই পরিমাণ ফল বিক্রি করে ২০ হাজার টাকা তিনি উপার্জন করেন যা ছিল তাঁর চাষের খরচের থেকে সওয়া গুণ বেশি।

কৃষি প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের এই সফল প্রয়োগের ফলে এরপর তিনি এক একর জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করলেন। চাষের খরচ দাঁড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। ফসল বিক্রি করে আয় হলো ২০ লক্ষ টাকারও বেশি। এরপরের পর্যায়ে আড়াই একর জমিতে তিনি ড্রাগন ফ্রুটের চারা রোপণ করেছেন, যেগুলো ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে চলেছে। এছাড়াও তিনি ১০ একর জমিতে তাঁর নতুন ড্রাগন ফ্রুট ফার্ম তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এর সঙ্গে ফার্মের জমির একটি অংশে মাছচাষের জন্য জলাশয়ও খনন করেছেন। এখন তিনি ওই অঞ্চলের অন্য কৃষকদেরও নানা ভাবে সহায়তা করছেন।

যশপাল তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, কৃষিকাজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার সঙ্গে কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ খুবই জরুরি। ২-৪ একর জমির অধিকারী কৃষকরা পরম্পরাগত কৃষিকাজের মাধ্যমে ফসল ফলিয়ে যতটুকু উপার্জন করবেন, তার বহু গুণ উপার্জন সম্ভব ফল ও সবজি চাষের মাধ্যমে। সেই কৃষকদের জন্য ড্রাগন ফ্রুট সমৃদ্ধ ফলের বাগান একটি বিকল্প কৃষিকাজের প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে। ড্রাগন ফ্রুটের গাছ একবার রোপণ করলে পরবর্তীকালে প্রায় ২০-২৫ বছর ধরে এর ফল পাওয়া যায়। ভারতে ড্রাগন ফ্রুটের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। এই কারণে বেরিলির মতো একটি ছোট শহরে ড্রাগন ফ্রুটের যথেষ্ট ভালো দাম পাওয়া যায়। ড্রাগন ফ্রুটের গাছ হলো ক্যাকটাসের মতো। ড্রাগন ফ্রুটের বাগান তৈরির জন্য প্রায় ৫ ফুট উঁচু পিলার সম্পন্ন মাচা নির্মাণ আবশ্যক। এই মাচা পদ্ধতিতে ড্রাগন ফল চাষের ক্ষেত্রে মাচার একটি পিলার বা স্তম্ভের সাহায্যে চারটি ড্রাগন ফলের চারা বড়ো হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি স্তম্ভে এইভাবে ২০-২৫ কিলোগ্রাম ড্রাগন ফলের উৎপাদন সম্ভব। কৃষিকাজে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যশপাল এই প্রজন্মের কৃষক সমাজের কাছে স্বনির্ভরতার এক মূর্ত প্রতীক। □

ব্যবহারিক বুদ্ধির মূল্য

এক নগরে চার বন্ধু থাকত। লব্ধবিদ্য, কৃতবিদ্য, অশেষবিদ্য আর সুবুদ্ধি। প্রথম তিনজন লেখাপড়া শিখে খুব বিদ্বান হয়েছে কিন্তু তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব ছিল। সুবুদ্ধি বন্ধুদের মতো অত লেখাপড়া করেনি বটে কিন্তু তার ব্যবহারিক বুদ্ধি ছিল প্রচুর।

লেখাপড়া শিখেও তেমন কাজকর্ম পাচ্ছে না বলে তাদের খুব চিন্তা। একদিন তারা আলোচনা করে ঠিক করল কাজের খোঁজে পুবদেশে যাবে। সেই মতো চার বন্ধু কাঁধে পোঁটলা ঝুলিয়ে পাড়ি দিল অজানা অচেনা দেশে। যেতে যেতে অনেক পথ পার হলো তারা। একসময়ে লব্ধবিদ্য কৃতবিদ্যকে বলল, সুবুদ্ধিটা শুধু বুদ্ধি আছে, আমাদের মতো তার অত লেখাপড়া নেই। জ্ঞান না থাকলে বিদেশে গিয়ে ও রোজগার করবে কীভাবে? মাঝখান থেকে ও আমাদের রোজগারে ভাগ বসাবে। তার থেকে ও বরং বাড়ি ফিরে যাক।

শুনে কৃতবিদ্য বলল, তোমার কথাটা একেবারে ঠিক। ওর বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। কাছে গিয়ে সুবুদ্ধিকে বলল, ভাই, তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও। তোমার তো কোনো বিদ্যা নেই। বিদেশে গিয়ে বিদ্যা না থাকলে তুমি রোজগার করবে কীভাবে?

সুবুদ্ধি বলল, ঠিক বলেছ। আমার পেটে বিদ্যা নেই। আমি তোমাদের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি ফিরে চললাম। সেই সময় তাকে বাধা দিয়ে অশেষবিদ্য বলল, আমরা চারজন বন্ধু। অন্য বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, ছি ছি! তোমাদের কাছে বিদ্যা, টাকাকড়ি বড়ো হলো? আমাদের বন্ধুত্বটা কিছু নয়? সুবুদ্ধি আমাদের সঙ্গে চলুক। আমরা যা আয় করব তাই সবাই ভাগাভাগি করে নেব।

অশেষবিদ্যর কথা শুনে দুই বন্ধু সত্যিই লজ্জা পেল। চারজনে আবার পথ চলতে থাকল। যেতে যেতে পথে পড়ল এক গভীর বন। কিছুটা গিয়ে তারা দেখল কোনো জন্তুর হাড়গোড় পড়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। কাছে গিয়ে লব্ধবিদ্য বলল, ভালোই হলো। আমরা তিনজনে যে বিদ্যা শিখেছি, তা এবার পরখ করে দেখা যাক। যে পশু মরে গিয়েছে, তাকে আমরা বাঁচিয়ে তুলব। এই বলে সে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করল। অমনি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাড়গোড় গুলো খটাখট শব্দে জুড়ে গেল। তৈরি হলো একটা পশুর কঙ্কাল। কিন্তু তখনো বোঝা

গেল না সেটা কোন পশু।

সুবুদ্ধি ভয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বিদ্যার বহর দেখতে লাগল। কৃতবিদ্য বলল, আমি এবার একটা আস্ত জানোয়ার বানিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে যেই মন্ত্র উচ্চারণ করল অমনি দেখা গেল মাংস ও চামড়ায় ঢাকা পড়ল কঙ্কাল। আস্তে আস্তে নখ, দাঁত, চোখ নিয়ে এক বিশাল সিংহে পরিণত হলো। তার কেশরখানাও জুড়ে গেল। সিংহটা যেন ঘুমিয়ে আছে।

অশেষবিদ্য বলল, এইবারে আমি মৃত সিংহটাকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে তুলব। সুবুদ্ধি ছুটে এসে তাকে বাধা দিয়ে বলল, কর কী! দেখছ না এটা একটা সিংহ, একে বাঁচিয়ে তুললেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন কোথায় থাকবে তোমার মন্ত্রশক্তি?

অশেষবিদ্য বন্ধুর ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, যেমন তোমার বুদ্ধি তেমনই তোমার উপদেশ। আমরা এত কষ্ট করে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলাম, সেটা একবার প্রয়োগ করে দেখব না? এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে?

সুবুদ্ধি বলল, তোমার বিদ্যার ওপর আমার আর কোনো ভরসা থাকছে না। মরা সিংহকে তোমরা বাঁচিয়ে তুলতে চাইছ? নিজেরা বেঁচে থাকলে তো ভবিষ্যতে সঞ্জীবনী বিদ্যা কাজে লাগবে!

তার কথা শুনে কৃতবিদ্য ও অশেষবিদ্য হেসে বলে উঠল, কেন তুমি অশেষবিদ্যকে বাধা দিচ্ছ? মন্ত্রের কেরামতি তুমি একবার নিজের চোখে দেখবে। এ সুযোগ তো বারবার আসে না।

সুবুদ্ধি বলল, চল আমরা ওই গাছের উপরে গিয়ে বসি। মিথ্যে কেন বিপদকে ডেকে আনি। তিন বন্ধু পরিহাস করে বলল, সুবুদ্ধি তোমার যদি এত ভয় তো তুমি গাছে উঠে বস। আমরা কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মন্ত্রের ক্ষমতা পরখ করি।

আরও কিছুক্ষণ এই নিয়ে তর্কাতর্কি চলল। শেষে সুবুদ্ধি বন্ধুদের বোঝাতে না পেরে গাছের ডালে উঠে বসল। সে লেখাপড়া শেখেনি বলে বন্ধুরা তার কথা শুনল না। সে গাছের ওপর থেকে বিষণ্ণ মুখে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইল।

এদিকে অশেষবিদ্য চোখ বুজে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করল। নিষ্প্রাণ সিংহের বিশাল দেহটা মাটিতে পড়ে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল সিংহটা ধীরে ধীরে চোখ খুলল। তখন মন্ত্র পড়া সবে শেষ হয়েছে। তিন বন্ধু চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছে সেই দৃশ্য। এমন সময় প্রচণ্ড গর্জন করে সিংহটা লাফিয়ে পড়ল অশেষবিদ্যর ঘাড়ে, সামনে দুই বন্ধুকেও থাবার আগাতে মাটিতে শুইয়ে দিল।

জীবন ফিরে পাওয়া ক্ষুধার্ত সিংহের থাবায় নিজেদের বোকামির জন্য তিনজনই প্রাণ দিল। গাছের ওপর বসে সারারাত সুবুদ্ধি চোখের জল ফেলল বন্ধুদের শোকে। তারপর সকাল হলে বাড়ির পথ ধরল।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

তমা ডোরা

ওড়িশার মালকানগিরিতে জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী তমা ডোরার জন্ম। তিনি কোয়া জনজাতি সমাজের মানুষ ছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রশমন হওয়ার পরে তিনি ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৮৮০ সালে তিনি মালকানগিরি পুলিশ থানা আক্রমণ করে ব্রিটিশ পুলিশদের হত্যা করে মালকানগিরিকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ সেনার বড়ো দল পৌঁছালে তাদেরও সম্মুখ সমরে পরাজিত করেন। তারপর আরও বড়ো দল পৌঁছালে বীরবিক্রমে লড়াই করে তিনি বীরগতি প্রাপ্ত হন।

জানো কি?

- বুলেট ট্রেনকে বাংলায় উচ্চগতির ট্রেন বলা হয়।।
- বাঁশ হলো পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো ঘাস।
- হাওড়া কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গের যমজ শহর বলা হয়।
- উত্তরপ্রদেশকে ভারতের চিনির বাটি বলা হয়।
- ইজরায়েলের প্রত্যেক নাগরিক এক-একজন সৈনিক।
- টুইটারের লোগোতে যে পাখির ছবি দেখা যায় তার নাম ল্যারি।
- স্ত্রী বাঘকে ইংরেজিতে ট্রাইগ্রেস বলা হয়।।

ভালো কথা

স্বাধীনতা দিবস

এবার স্বাধীনতা দিবসে সারাদিন খুব আনন্দে কাটিয়েছি। সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আমাদের হস্টেলে দাদাভাইয়েরা একের পর এক গল্প বলেছেন। ক্ষুদিরামের, ঋষি অরবিন্দের, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর, মাস্টারদা সূর্য সেনের ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের। দুপুরে টিভিতে ক্ষুদিরামের সিনেমা দেখেছি। সন্ধ্যায় ভগৎ সিংহের। দেখতে দেখতে চোখে জল আসছিল। দাদাভাইয়েরা বললেন, স্বাধীনতা দিবসে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা স্মরণ করতে হয়।

সুজিত মাহাত, সপ্তমশ্রেণী, হুড়া , পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বর্ষা

পায়েল চক্রবর্তী, অষ্টমশ্রেণী, সোনামুখী, বাঁকুড়া।

গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা এসে
প্রকৃতিকে দিল হেসে,
চারিদিকে সবুজ সবুজ
বাতাস বহে মধুর মধুর।

চাষিরা সব বুনছে ধান
আনন্দেতে গাইছে গান
সোনার ফসল উঠবে ঘরে,
আসছে পুজো কদিন পরে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

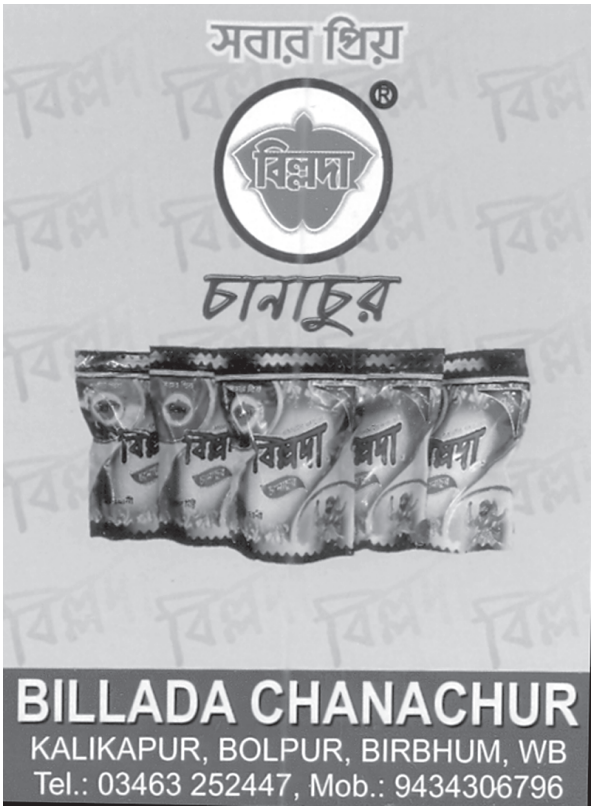

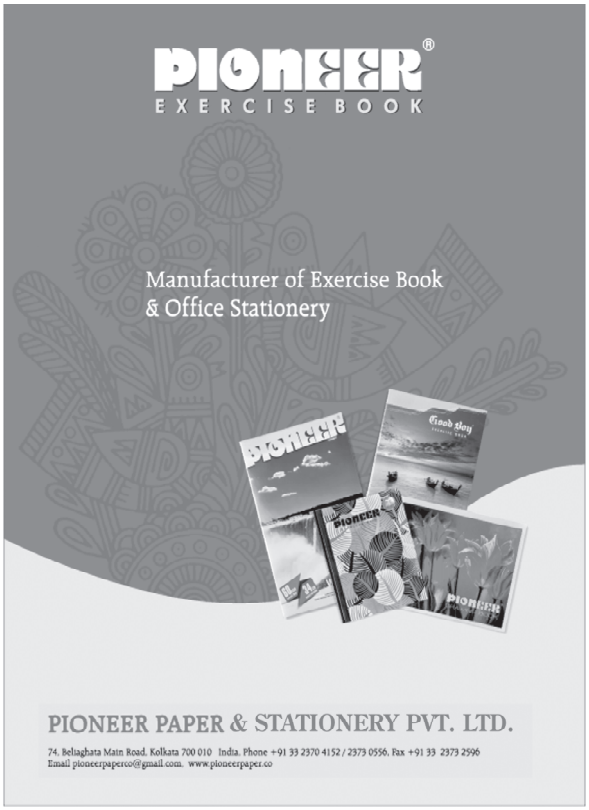

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কলকাতা রাজভবনে এখন সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার

প্রবীর ভট্টাচার্য

কলকাতা থেকে অন্য কোনও স্থানের দূরত্ব গণনা করতে হলে যেখানে কেন্দ্র করে এই গণনা হয় তা হলো মধ্য কলকাতার কেন্দ্রে অবস্থিত রাজভবন। রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে এই রাজভবনের নাম এখন প্রতিদিন খবরের শিরোনামে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়। কতজন মানুষ গেছেন রাজভবনে? উত্তর নিশ্চয়ই আশাপ্রদ হবে না। নির্দিষ্ট কিছু সরকারি কর্মচারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া রাজভবনে ঢোকার অনুমতি কারোর নেই। কিন্তু কেউ কি জানেন রাজভবনের নতুন পরিচয় 'গণরাজভবন'। গত ২৫শে বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের ২২তম মহামহিম রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রাজভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার দিয়ে আদেশ জারি করেছেন। এর পর থেকেই রাজভবনে সাধারণের প্রবেশের অধিকার মিলেছে।

রাজভবন কলকাতার ঐতিহ্য ভবনের এক অপূর্ব নিদর্শন। ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও অসংখ্য ঐতিহাসিক চিত্র ভবনের অন্দর মহলের চতুর্দিকে সজ্জিত রয়েছে। বহুতল বিশিষ্ট এই ভবনে এশিয়ার প্রথম লিফট দেখা যায়। যা এখনো সচল। ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক এই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে কলকাতার আর এক ঐতিহ্য ভারতীয় জাদুঘর সাধারণ নাগরিকের জন্য প্রতি শনিবার রাজভবন দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকে। জাদুঘরের শিক্ষা আধিকারিক সায়ন ভট্টাচার্য্যের চমৎকার ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি সামাজিক সংগঠন বাংলা আবারের ব্যবস্থাপনায় মহানগরের কয়েকজন নাগরিকের জন্য গণরাজভবন ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি রাজভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ওই একদিনই। তারপর আবার যে কে সেই! এই অধিকার আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

২৭ একর জমির ওপর অবস্থিত এই ভবনকে আগে বাকিংহাম প্যালেস বলা হতো। ১৭৯৭ সালে মার্কুস ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব নিতে এসে ব্রিটিশ রাজের বাসস্থান হিসেবে ক্যাককাটা গভর্মেন্ট হাউস বা আজকের রাজভবন তৈরি করেন। ১৭৯৯ সালে এর ভিত্তি স্থাপনের পর ১৮০৩ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ডার্বিসায়রে কার্জনের পৈত্রিক ভিটা কেডলেসটন হলের আদলে এই ভবনের নকশা প্রস্তুত করেন দ্য বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ক্যাপ্টেন চার্লস ওয়াট। প্রাসাদ টি নির্মাণে সেই সময় ব্যয় হয়েছিল ১৩ লক্ষ টাকা।

রাজভবন নাম করলেই প্রথমেই মনে পড়ে ভবনের ছ' ছটি সদর দরজার। উত্তরের দরজা দিয়ে সাধারণ বা অতিথিরা ভবনের মধ্যে প্রবেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশের পথও এটিই। এই দরজার চূড়ায় আগে ব্রিটিশ রাজশক্তির ফলক ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই ফলক নামিয়ে দরজার দুই পাশে অশোক স্তম্ভ বসানো হয়। দক্ষিণ দরজা দিয়ে রাজ্যপাল নিজে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানেরা এলে এই দরজা ব্যবহার করেন। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে মোট চারটি সিংহদরজা রয়েছে। মূলত এগুলি বন্ধ থাকে। উত্তর দরজা দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটি কামান।

১৯৩৯ সালে চীন-ব্রিটেনের যুদ্ধে এই কামান ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই যুদ্ধে হংকঙের অধিকার হারায় চীনারা। শোনা যায় পঞ্চাশের দশকে ভিয়েতনামের শাসক হো-চি-মিন এই শহরে

এলে রাজভবন থেকে চীনা পরাজয়ের প্রতীক এই কামানটিকে সরিয়ে ফেলার কথা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজ্যের চতুর্থ রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু নাকি তাতে অস্বীকার করেন।

রাজভবনের স্থাপত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রভাব রয়েছে। মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ ভবনের একেবারে সম্মুখে যে সোপানগুলি উঠে যাচ্ছে তার দু'পাশে রয়েছে দুটি স্ফিংসের মূর্তি। এই সোপান ধরে উপরে উঠলেই দরবার হল। ব্রিটিশ ভারতের লাট বাহাদুর এই দরবার কক্ষে বসে শাসনকার্য সম্পাদন করতেন। সাধারণ নাগরিকদের এখন অবশ্য এই সোপানে ওঠা বা দাঁড়ানোর অনুমতি নেই। মহামহিম রাজ্যপাল বা সম্মাননীয় অতিথিরা যে পথে ভবনে প্রবেশ করেন সেখানে রয়েছে কার্তিক ও গণেশের দুটি সুদর্শন মূর্তি। রাজভবনের দীর্ঘ অলিন্দের দুপাশে রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্তির প্রতিরূপ। আছে দেবী সরস্বতী, লক্ষ্মী, চণ্ডী, মহাদেব নটরাজ, পাল যুগের দু হাত উপরে তাল দেওয়া নতেশ্বরের মূর্তির প্রতিরূপও। ভারতীয় জাদুঘরে এগুলির আসল ভাস্কর্যগুলি রয়েছে। রাজভবনের চতুর্দিকে রয়েছে অসংখ্য চিত্র ও আলোক চিত্র। ১৯৪৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় থেকে ক্রম অনুযায়ী সকল মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালদের নানা সময়ের ও মুহূর্তের ছবি। কলকাতায় ভ্রমণে আসা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের অসংখ্য আলোক চিত্র। □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অপসংস্কৃতি মুক্ত করতে হবে

দিগন্ত চক্রবর্তী

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া জঘন্য ঘটনাটি নাড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র রাজ্যবাসীকে। কী ঘটেছিল? উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতা তথা দেশের অন্যতম নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুরে পড়তে এসেছিল নদীয়ার একটি গ্রামের ছেলে স্বপ্নদীপ কুণ্ডু। না, স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগটা পায়নি সে, কয়েকদিনের মধ্যে সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানেই যে নিভে গেল তার জীবনদীপ! যেখানে সিনিয়র দাদা হিসেবে ছোটো ভাইয়ের মতো আগলে রাখা উচিত, সুপরামর্শ দেওয়া উচিত সেখানে তার ওপর নেমে এসেছিল পৈশাচিক অত্যাচার। অভিযোগ অনুযায়ী যারা এই নৃশংস কাজটির সঙ্গে যুক্ত তারাও কিন্তু এই নামি প্রতিষ্ঠানটির তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ছাত্র। তারা যে উচ্চশিক্ষিত! তাই আধুনিকতার দোহাই দিয়ে তারা মুক্তচিন্তার কথা বলে। এই কি তাদের উচ্চশিক্ষার নমুনা? এরকম উচ্চশিক্ষিত বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কি আদৌ দরকার আছে সমাজে? না থাকলে ছেলেটিকে অন্তত এরকমভাবে অকালে প্রাণ দিতে হতো না। যে ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষায় উন্নত, সারা বিশ্ব থেকে যে ভারতবর্ষ ছাত্র-ছাত্রীরা আসতো শিক্ষা গ্রহণ করতে, সেই ভারতবর্ষে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রাণ দিতে হবে একটি ছাত্রকে!

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে শুধুমাত্র তার ও তার পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তা নয়, শহর থেকে দূরদূরান্তের গ্রামের যে ছেলে-মেয়েরা কলকাতার নামি প্রতিষ্ঠানে এসে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখে তাদের অনেকেই হয়তো কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতে ভয় পাবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠিয়েও বাবা মা-কে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর

হয়তো তাদের মনে হবে আগে তো প্রাণে বাঁচুক, তারপর না হয় নামি প্রতিষ্ঠানের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি! সন্তানই যদি না থাকে তাহলে আর কীসের উচ্চশিক্ষা। মনে পড়ে যাচ্ছে স্বামীজীর সেই বাণী, 'মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যমান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।' সত্যিই তো চারিদিকে ডিগ্রিধারী এত উচ্চ শিক্ষিত আছেন, কিন্তু মানুষের আজ বড়োই অভাব। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এটাই মনে হয় রাজ্যবাসীর প্রার্থনা হওয়া উচিত যে উচ্চ শিক্ষিত নরপিশাচ নয়, দেশ তথা সমাজের কল্যাণে স্বামীজীকথিত মানুষ চাই।

প্রশ্ন ওঠে, যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় ছেলেটিকে প্রাণ দিতে হলো তাদের কী হবে? তারা কি এখনো সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে পরবর্তী শিকারের জন্য? হ্যাঁ 'শিকার' কথাটা ব্যবহার করলাম, কারণ যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা মানুষের রূপ ধারণ করে থাকলেও তারা আসলে মানুষরূপী নরপিশাচ। স্বপ্নদীপ আর ফিরে আসবে না, কিন্তু প্রশাসনের কাছে দাবি, তারা দোষীকে চিহ্নিত করে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আর কোনো স্বপ্নদীপের জীবনদীপ যেন এরকম ভাবে নিভে না যায় কিছু বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষরূপী অমানুষগুলোর জন্য। কোনও বাবা-মায়ের কোল এরকম ভাবে না খালি হয়ে যায়।

তবে স্বপ্নদীপের এই মৃত্যুর জন্য যে শুধুমাত্র কয়েকজন ছাত্রই দায়ী তা কিন্তু নয়। এর জন্য দায়ী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিকৃত মানসিকতা। আর এই বিকৃত মানসিকতা যারা ধারক ও বাহক, যারা আবার নিজেদের মুক্তমনা বলে দাবি করে নিজেদের অতি আধুনিকতার প্রমাণ দিতে গিয়ে মদ, গাঁজা, র‍্যাগিং নামক অপসংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেই পুরো চক্রটাকে শেষ করা প্রয়োজন।

আমরা যদি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাব তখন যে গুরুকুল পদ্ধতি চালু ছিল সেই সময়ে ছাত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বজায় ছিল। আজও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে--- উদাহরণস্বরূপ রামকৃষ্ণ মিশন, বিদ্যা ভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গুরুকুল, সেখানে কি আমরা এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটার কথা ভাবতে পারি বা কখনো শুনেছি এরকম ঘটনা ঘটেছে? আধুনিকতার নামে যত আমরা ভারতের সনাতন সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ততই এই অপসংস্কৃতিগুলি আমাদের গ্রাস করছে, যার ফসল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাপ্রবাহ সৌরভ, মনোতোষরা। শুধু কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেই যে এই সমস্যা মিটবে তা নয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে গেলে, অপসংস্কৃতিগুলি দূরে সরাতে গেলে প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর সমস্ত স্তরেই পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ভারতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদের সমানভাবে অবহিত করাতে হবে।□

লাস্যময়ী স্ক্যানডিনেভিয়া

নরওয়ের গেইলো গ্রাম

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

২০০৪ সালে সপরিবারে ইউরোপ ভ্রমণের পর ১৬/১৭ জুন ২০২৩-এ পুনরায় ইউরোপ। প্রথমবারে মধ্য ইউরোপ—যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড ঘুরে আসি আর এবার স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলি। স্ক্যানডিনেভিয়ার অর্থাৎ এই নর্ডিক অঞ্চলের মূল দেশগুলি— সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, উত্তর সাগর উপকূলীয় রাশিয়া সংলগ্ন এস্তোনিয়া আমদের এবারের ভ্রমণ তালিকায়। GO EVERY WHERE-এর প্রতিনিধি পলাশ সেনের আগ্রহে ফের ইউরোপে। করোনা-পূর্ব ভ্রমণ সূচিতে আমেরিকা-কানাডা যাওয়ার জন্য অগ্রিম টাকা এই ট্যুরের টাকায় সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাওয়ায় প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম (উল্লেখ্য করোনার প্রকোপে আমেরিকা-কানাডা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়)। এবারের ভ্রমণ সূচিতে থাকা উল্লেখিত ৫টি দেশের বাইরেও—আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ড স্ক্যানডিনাভিয়া দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত, যদিও দেশ দুটিতে আমরা যাইনি। স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলি আর্টিক মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর মহাসাগর ও নরওয়েজিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী দ্বীপদেশের সমন্বয়। ভৌগোলিক অবস্থানে মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে খানিকটা আলাদা হলেও বা ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও এদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অখণ্ড এবং একসূত্রে গ্রথিত। তবে এই দেশগুলি ব্রিটেনের কলোনি না থাকায় রাস্তায় চলার নিয়ম উলটো অর্থাৎ ডানদিকে চলা, যা ইংরেজিতে দাঁড়ায়—'Keep to the Right' এই মহাদেশের ১২টি দেশ ঘোরার পরে আমার উপলব্ধি—ধর্ম, সংস্কৃতি এবং অবিভাজ্য ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ক্ষমতা ভোগের জন্যই আলাদা আলাদা সীমাবদ্ধ হয়েছে এই দেশগুলি—যেমনটি ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রে।

এবারের ট্যুরে আমার পার্টনার অপরচিত কাস্টমস্ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অমলচন্দ্র প্রামাণিক চন্দননগরের বাসিন্দা। গত বছর ২০২২-এর জুলাইয়ে কেনিয়া সফরের সময়ও পরিবারের বাইরের রুমসঙ্গী অভিজিৎ দাশ অবশ্য আমার স্টেট ব্যাংকের সহকর্মী এবং নিকট বন্ধু। পরিচিতের সঙ্গে রুমভাগ করে নেওয়ার কোনো সমস্যা নেই, হওয়ার কথাও নয়। প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হতে পারে তা হচ্ছে, বাথরুম ব্যবহার নিয়ে। সেক্ষেত্রে আমি হোটেলে গিয়ে প্রথম দিনেই বাথরুম ব্যবহার নিয়ে কথা বলে নিই, তাতে কিন্তু অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব, অন্যথায় আপনার ভ্রমণের পুরো আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। ঝুঁকি সত্ত্বেও কেন অপরিচিতের সঙ্গে রুম শেয়ার করছি, তার কারণ মূলত দুটি। বিদেশ ভ্রমণে একা রুম নেওয়ার খরচা প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষাধিক টাকা বেশি। দ্বিতীয় কারণ বয়সজনিত। আমার মতো সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিদের, ভ্রমণে এককভাবে হোটেলে রাত্রি যাপন করাটা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই– বিশেষ করে আমার মতো ৫ খানা এস্টেন্ট stent) বসানো বা বাইপাস হওয়া হৃদরোগীদের জন্য। তাছাড়া নিজের মোবাইলে wake up কল শুনতে না পেলেও রুম পার্টনারের সাহায্য পাওয়া যায়। তবে এর মানে এই নয় যে, অপরিচিত রুম পার্টনারের সঙ্গে সমস্যা হবে বা বৃদ্ধ বয়সে একা ভ্রমণ করা যাবে না। এ পর্যন্ত আমার কারুর সঙ্গে কোনো সমস্যা হয়নি, গ্রুপ ট্যুর সহযোগিতার মনোভাব পুরো ভ্রমণটাকে আনন্দময় করে তোলে। এ বিষয়টি অবতারণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার মত বয়স্ক ভ্রমণেচ্ছুদের বাইরে বেরনোর প্রেরণা জোগানো।

আমার কাছে বিদেশ ভ্রমণ শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ বা বিদেশে বড়ো হোটেলে বিলাসবাসনে কয়েকটি দিন কাটানো নয়, কিছুটা হলেও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা— সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি,রাজতান্ত্রিক দেশগুলির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি। ইউরোপীয়, আফ্রিকান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ইংরেজি জানা থাকলে ভাষা সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে আর চোখের দেখা তো আছেই। তবে রাশিয়া-চীনে ভাষা বিনিময় খুবই দুরূহ—একমাত্র গাইডের সাহায্য ছাড়া। রাশিয়া দেশটি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও আভিজাত্যে ইউরোপ ঘরানার— রাস্তাঘাট পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, মানুষজন পর্যটকবান্ধব।

অপরপক্ষ চীনে ঐতিহ্যপ্রিয়— দেশগর্বী রাস্তাঘাট জঞ্জালমুক্ত, রেলস্টেশন-বিমান বন্দরগুলি ঝাঁ-চকচকে, স্টেডিয়ামগুলি আন্তর্জাতিক মানের। জানান দিচ্ছে আমরাই শ্রেষ্ঠ। সাংহাইয়ের আকাশচুম্বী অট্টালিকার মতো ওদের প্রত্যাশা বাঁধনহারা, কিন্তু পর্যটক-বান্ধব নয় বলে আমার মনে হয়েছে। অথচ ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা নাই, আছে সহযোগিতার মনোভাব। ওঁদের আচার- আচরণেই প্রমাণ হবে সভ্যতার দাবিদার ওরাই। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যায়—পথ চলতে গিয়ে পথ নির্দেশিকা না মানায় অভ্যস্ত আমরা। রাস্তার পার হওয়ার সিগনাল না মেনে রাস্তায় ঢুকে পড়লে মোটরগাড়িগুলি একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনাকে ইশারা করবে রাস্তা পার হতে। শৃঙ্খলাহীন পথচলতি বিদেশিদের প্রতি ওদের ওই ভদ্রতা আমাকে মুগ্ধ করে। জাপান-চীন-মঙ্গোলিয়া থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং দেশের মধ্যে না আছে সাংস্কৃতিক ঐক্য বা একক ঐতিহ্যের ইতিহাস—নৃতাত্ত্বিক গঠনেও তা স্পষ্ট। প্রাচ্যের এই দেশগুলির শিল্প-বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিতে যতই এগিয়ে যাক না কেন—আমার মনে হয় আমরা যেন অন্য গ্রহের মানুষ।

এবারে আসা যাক বর্তমান ভ্রমণ প্রসঙ্গে কিছু কথায়। আমরা ১৭ জুন রাত ৩-৫০ মিনিটে কাতার বিমানে দোহায় যাই। বিমান পালটে ফের কাতার বিমানেই ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিনকি (Helsinki) পৌঁছাই বিকেল ৩-৫০ মিনিটে। ভারতীয় সময় হিসাবে হবে বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট। বিমানবন্দর থেকে সোজা আমাদের জন্য নির্ধারিত প্রেসিডেন্টি হোটেলে চেকইন করার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর রাতের খাবারের জন্য ভারতীয় রেস্তোঁরায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি হোটেলে রাত্রে ঢালাও ডিনারের ব্যবস্থা এবং জাহজ ভ্রমণে (ক্রুজে) রাত্রে বুফে ডিনার ছাড়া বাকি দিনগুলিতে রাত্রের খাবার ভারতীয় রেস্তোঁরায়ই হয়েছে। আর সব দিনই রাত্রিযাপনের হোটেলে বা ক্রুজেই সকলে ঢালাও ব্রেকফার্স্ট বা প্রাতরাশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল নিয়মানুসারেই হয়েছে। আমার মতো ভোজনরসিক বাঙ্গালিরা রসনা তৃপ্তিতে কার্পণ্য করেনি। অনেকের কাছে হজমের বড়ি থাকলেও ব্যবহার করতে হয় না, কারণ বিদেশিরা খাবারে খুব কম মশলা ব্যবহার করে।

হেলসিনকিতে নেমে বিস্ময়ভরা চোখে শুধু ওখনকার মানুষজনকে দেখছিলাম—ছ'ফুটের বেশি লম্বা (পুরুষ/মহিলা)। অপূর্ব শারীরিক গঠন এবং দুধ-সাদা গায়ের রঙের মানুষগুলোকে যেন দেবদূতের মতো লাগছিল। নিঃশব্দে পথ চলছে শৃঙ্খলা মেনে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তুলনায় নিজেদেরকে মনে হচ্ছিল যেন অন্য গ্রহের লোক। জানলাম, দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৫৬ লক্ষ এবং আয়তন ৩,৩৮,৪৫৫ বর্গকিমি.। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে তিনগুণ। অথচ জনসংখ্যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অর্ধেকের মতো। তাই বলে তার সম্পদের অভাব নেই, নানা ধরনের ধাতব দ্রব্য যেমন জিঙ্ক, ক্রোমাইট, নিকেল, সোনা, রুপা ইত্যাদি। আর বনসম্পদে ফিনল্যান্ড সহ সমগ্র স্ক্যানডিনেভিয়া ভরপুর। কাষ্ঠজাত দ্রব্য রপ্তানি করে সব দেশ। ইলেকট্রিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি করে ফিনল্যান্ড। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বার্লি, গম, রাই চাষ হয় ফিনল্যান্ডে। এই দেশটির মাথা পিছু আয় ভারতের তুলনায় ৭ গুণেরও বেশি। অর্থনীতি বাদ দিয়ে যা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছে তা হচ্ছে দেশটির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মানুষের শৃঙ্খলা মেনে চলার সহজাত প্রবৃত্তি। জঞ্জালমুক্ত ও দূষণহীন পরিবেশ। সকল মানুষজনই যেন নিশ্চিন্ত হাসিমুখ এবং উৎসবপ্রিয়। তাই তো জাতিসঙ্ঘের মাপকাঠিতে ফিনল্যান্ড পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ নির্বাচিত হচ্ছে বারে বারে। Happiest Country in the World। আমাদের গাইড বলছিলেন—ফিনল্যান্ডে মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০০ সদস্যের আইনসভায় মহিলা সদস্যা রয়েছেন ১০২ জন। ২০২৩ এর প্রথম দিকেও এই দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন মহিলা, নাম Ms. Sanna Marin। হেলসিনকি শহর পরিক্রমায় হেলসিনকির ক্যাথেড্রাল নামে পরিচিত সেইন্ট নিকোলাস চার্চ, পাইপ দ্বারা নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত সিভিলিয়াস মনুমেন্ট, অডিস লাইব্রেরি, অলিম্পিক স্টেডিয়াম দর্শন করি।

হেলসিনকি থেকে ক্রুজে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সীমাহীন সমুদ্রের নীল জল, অসংখ্য উপকূলীয় দ্বীপ—কোনো কোনো দ্বীপে দু'চারটে ছোটো ছোটো বাড়িঘর দেখতে দেখতে মাঝে ৪ ইউরো খরচা করে (৩৬০-৬৫ ভারতীয় মুদ্রা) এক কাপ কফি খেতে উত্তর সমুদ্রের তটবর্তী ছোট্টো দেশ Estonia রাজধানী Tallinn সামুদ্রিক বন্দরে গিয়ে আমাদের জাহাজ ভিড়লো। বলে রাখি, এই দেশটি রাশিয়ার অঙ্গরাজ্য ছিল এবং ১৯৯১ সালে মিখাইল গর্ভাচভের পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাস্তনস্তে সওয়ার হয়ে দেশটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। এস্তোনিয়া দেশটি তখন রাশিয়ার কবলমুক্ত হয়। এস্তোনিয়ার দেশভক্ত গাইড রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। এমনকী বিশ্বে যেখানেস কমিউনিস্ট শাসন আছে—আমাদের দেশের কেরালা রাজ্য সহ (সম্ভবত ভারতীয় পর্যটকদের ফিডব্যাক) তুলোধনা করলেন। ১৯৯১ সালে গ্লাস্তনস্ত হাওয়ায় মুক্ত এস্তোনিয়া তার পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাদ পেয়েছে। স্বাধীনভাবে দেশগঠন এবং জীবন উপভোগ করছে। মাত্র ৪৫,২২৭ বর্গকিমি. দেশ যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের মত অথচ শিল্প, বাণিজ্য এবং আর্থিক উন্নয়নে উন্নত দেশগোষ্ঠীর সমতুল্যই নয়, বরং তাদের মাথা পিছু জাতীয় আয় অনেক উন্নত দেশের থেকেও বেশি। ব্যাংকিং, জাহাজ নির্মাণ, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য রপ্তানি ছাড়াও, কৃষিজাত দ্রব্য, যেমন—চা, কফি, বার্লি, গম, ওটস্, আলু ইত্যাদির চাষ হয়। ফিনল্যান্ডের মতো এস্তোনিয়ার মানুষজন পর্যটক বন্ধু দেশটির মানুষ সুখী, সমৃদ্ধ এবং আনন্দপ্রিয়। এখানের প্রধানমন্ত্রী Ms. Kaja Kallas (গাইডের ভাষায় Beautiful Lady)। নারী স্বাধীনতার ঢেউ ফিনল্যান্ডের সমুদ্র পেরিয়ে এস্তোনিয়ায় আছড়ে পড়েছে তা আমরা স্পষ্ট অনুভব করছি।

এবার আমাদের সুইডেন ভ্রমণের পালা। হেলসিনকি থেকে Tallunk Silja Cruise চেপে সুইডেনের রাজধানী Stockholm পৌঁছাই রাতভর যাত্রার পরে সকাল ৯টায়। অবতরণের পূর্বেই ক্রুজে আন্তঃমহাদেশিক প্রাতরাশ সমাপ্ত হয়। স্টকহোম পোর্ট থেকে বাইরে বেরোনোর সময় চারিদিকে মন্ত্র মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলাম খানিকক্ষণ। অপরূপ সৌন্দর্যে সাজানো এই বন্দর শহরটি। এই শহরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ১৮২৩ সালে নির্মিত সিটি হল, নর্টিংহাম রয়াল প্যালেসের সামনে রয়াল গার্ড সিরিমনি (অনেকটা বাকিংহাম প্যালেসে Change of Guards Ceremony মতো), রয়াল থিয়েটার, স্টকহোম ক্যাথেড্রাল, নোবেল মিউজিয়াম আমরা ঘুরে দেখলাম। গাইড আলফ্রেড নোবেলের এই প্রাইজ প্রবর্তনের ইতিহাস আমাদের বললেন–আমরা ঘুরে ঘুরে মিউজিয়ামটি দেখলাম। বিশেষ করে ভারতীয় নোবেল প্রাইজ প্রাপকদের গ্যালারিটি দেখলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে অমর্ত্য সেন সবাই রয়েছেন। বাল্টিক সাগর উপকূলে স্টকহোম শহরটি ১৪টি দ্বীপের সমন্বয়ে

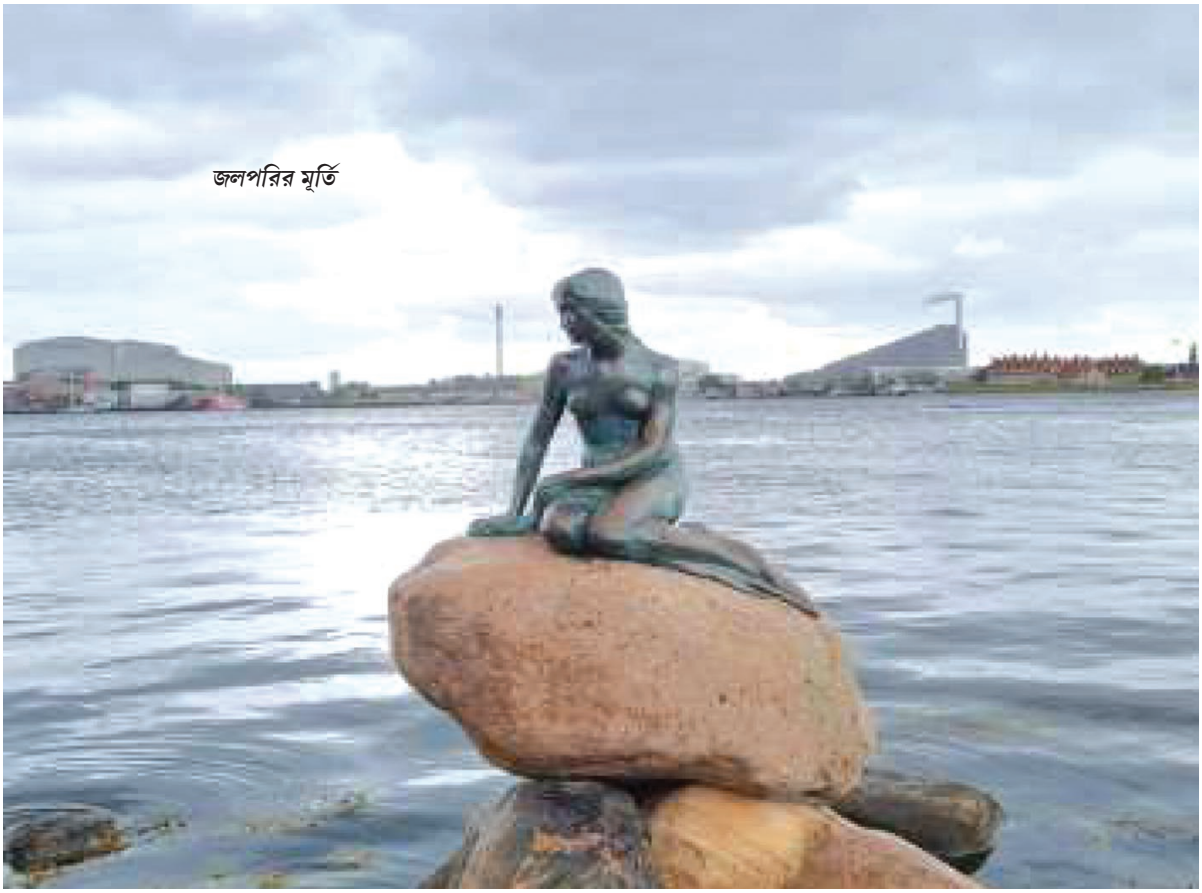

জলপরির মূর্তি

গঠিত এবং সুইডেন দেশটিতে রয়েছে শত শত দ্বীপপুঞ্জ। স্টকহোমের আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম এবং অপেরা হাউসগুলি ঐতিহ্যমণ্ডিত। কৃষি-শিল্পে উন্নত এই দেশটি মোটর গাড়ি, ভারী যন্ত্রপাতি, টেলি যোগাযোগের উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। একমাত্র খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক পরিচ্ছদ আমদানি করে, যদিও বার্লি, গম ও ওটসের চাষ হয় এই দেশে। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে আয়তনে সর্ববৃহৎ এই দেশটি (৪.৪৭ লাখ বর্গকিমি.), আর স্টকহোম শহরটি স্ক্যানডিনাভিয়ার সাংস্কৃতিক শহর অভিধায় খ্যাত। এই দেশটির জনসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলির অন্যতম।

সুইডেনের ভ্রমণসূচি শেষ করে এবার সৌন্দর্যের রানি নরওয়ের উদ্দেশে যাত্রা। এই ট্যুরে শামিল হওয়ার আগেই বন্ধুদের কাছে নরওয়ের গল্প শুনেছি। মনটা শুধু ছটফট করছিল কখন নরওয়ে পৌঁছাব। এবারে আর সমুদ্রপথ নয়, বাসে করেই সৌন্দর্যে সুইজারল্যান্ডকে হার মানানো এই দেশটিতে যাওয়া যাবে। নরওয়ের রাজধানী OSLO-এর পথে নানা দ্রষ্টব্য স্থান ছুঁয়ে যাব। স্ক্যানডিনেভিয়ার এই দেশটি পাহাড়, গ্লাসিয়ার, অসংখ্য জলপ্রপাত (Waterfall) এবং সমুদ্র উপকূলে ঘেরা। রাজধানী অসলোর বাইরে যেন সবুজ কার্পেট বিছানো উপত্যকা, পাহাড়ের চূড়া থেকে আভূমি হালকা সাদা বরফে আচ্ছাদিত, শীতকালে সম্পূর্ণ বরফাবৃত থাকে শুনলাম। অসলো শহর থেকে বহু দূরের Voss, Gailo ইত্যাদি গন্তব্যস্থানে (দেড়/দুশো কিমি. দূরত্বে) পথিমধ্যে নরওয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের স্বাদ পেয়েছি। গ্রামের জীবনযাপন দেখতে দেখতে কোথাও কোথাও হেঁটে কিছুটা ভিতরের দিকে গিয়েছি, সব কাঠের বাড়িঘর—ছোটো ছোটো বাংলোর মতো ঢালু চালা যাতে বরফ আটকে না থাকে। ২/১টি বাড়ি ছাড়া সব বাড়িতেই তালা ঝুলছে—লোকজনের কোনো দেখা নেই। গেইলো এবং ভস সিটিতে আমরা যে চারতারা হোটেলে ছিলাম সেই ৫/৬ তলা বিশিষ্ট হোটেলগুলি সব কাঠ দিয়ে নির্মিত। অসলো নরওয়ের রাজধানী শুধু নয় ওই দেশের সর্ববৃহৎ শহর। এই দেশটির আয়তন ৩.৮৫ লক্ষ বর্গকিমিটার যা পশ্চিমবঙ্গের ৪ গুণেরও বেশি। অথচ জনসংখ্যা মাত্র ৫৪ লাখ ২৫ হাজার। প্রতি বর্গকিমিতে মাত্র ১৭ জন মানুষের বসতি, অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তাই তো নরওয়েতে মাথাপিছু গড় আয় ধনকুবের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি। অসলো শহরেই রয়েছে সিটি হল সেন্টার, ভিগল্যান্ড কালচারাল পার্ক এবং গ্রানাইট পাথরে তৈরি ১৭ মিটার উঁচু মনুমেন্ট Monolith, বিশ্বখ্যাত ব্রোঞ্জ নির্মিত 'The angry young boy'-এর মূর্তি ইত্যাদি। নরওয়ের পশ্চিম উপকূলে Bergen সমুদ্র বন্দরটি সবচেয়ে পুরানো বন্দর এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। UNESCO একটি World Heritage হিসাবে ঘোষণা করেছে। ছবির মতো এই বন্দর শহরটি থেকে চোখ ফেরানো যায় না। উত্তর ইউরোপের আর্টিক অঞ্চলের এই দেশটি ফিশিং, হাকিং এবং স্কাইং-এর জন্য বিখ্যাত। এই দেশে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস এবং খনিজ তেল রয়েছে যা নরওয়ের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও জাহাজ নির্মাণ, মৎস্যজাত দ্রব্য এবং বন সম্পদের ব্যবহার নরওয়ের বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার ভরিয়ে দিচ্ছে। আর্থিক সুস্থিতি, নাগরিক নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জনজীবনে নরওয়েবাসীকে

সুখী জাতিতে পরিণত করেছে।

এবারে আমাদের ডেনমার্ক যেতে হবে। গেইলো শহর থেকে অসলো প্রায় ২২০ কিমি. রাস্তা বাসে সময় লাগবে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। ওখান থেকেই শুরু হবে ফের সমুদ্র যাত্রা। আমাদের গন্তব্য সুইডেনের রাজধানী কোপেনহোগেন (Copenhagen) পৃথিবীর সবচেয়ে সবুজ শহর (No.-1 Green city of the World) এটি। রাতে ক্রুজে ব্যয়বহুল ডিনার এবং সকালে কন্টিনেন্টাল প্রাতরাশ সেরে ৯.৩০ মিনিটে DFDS ক্রুজের যাত্রা শেষে আমরা কোপেনহেগেনে নেমে পড়ি। এগারোতলা বিশিষ্ট এই জাহাজে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা অন্যরকম। দু'জনের জন্য এক একটি ক্যাবিনের মধ্যেই বাথরুম, টয়লেট। জাহাজের সব ফ্লোরেই ক্যান্টিন এবং একটি ফ্লোরে শপিং সেন্টার, সব মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড। কোপেনহেগেন হেলসিনকি বা অসলোর থেকে ছোটো শহর। রাস্তাঘাটও কিছুটা সংকীর্ণ এবং ব্যস্ত। শহরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক নইভান ক্যানেল, 'The Little Mermaid' (ছোট জলপরি), টাইভলি গার্ডেন, চারশো বছরের পুরানো রাজবাড়ি যেখানে রাজ পরিবারের বাসিন্দারা থাকেন, ক্রিশিয়ানবর্গ প্যালেস যেখানে পার্লামেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, ডেনমার্কের সুপ্রিম কোর্টের অফিস রয়েছে। বাল্টিক সাগর এবং উত্তর সাগরের উপকূলবর্তী এই দেশটির জনসংখ্যা ৬০ লাখের মতো এবং আয়তন, ৪২,৯৫২ বর্গকিমি; যা পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের মতো, স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলির মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে ছোটো। এই শহরে থাকার দিন সামান্য বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়, তবে ১০/১১ ডিগ্রির নীচে নয় ভোরবেলায়। পরেরদিন আমাদের ফের দোহা হয়ে কাতার বিমানে দেশে ফিরে যেতে হবে। ঘরে ফেরার টান থাকলেও এই মোহময় সৌন্দর্যের রাজপুরী থেকে যেতে চায় না মন। জানি, দেশে ফিরেই পঞ্চায়েত ভোটের জীবনহানির ঘটনা এবং সংঘর্ষের বিবরণ খবর হবে নিত্যদিন, নোংরা রাজনৈতিক আবর্তে ঢুকতে হবে—তবুও দেশে তো ফিরতেই হবে। থাকতে হবে দূষিত বায়ু, বিভাজিত সমাজ আর কলুষিত রাজনৈতিক আবহে। আর এভাবেই বাঁচতে হবে। শুধু মাঝের কয়েকটা দিন ছিল স্বপ্নের। সেরার সেরা সৌন্দর্যে বিশ্বসেরা স্ক্যানডিনেভিয়া তোমাকে বিদায়। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি।

এটি আগামী ৩ অক্টোবর '২৩ পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবতের করকমল দ্বারা বেলুড় মঠের প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা।

অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

রাজ্যে রাজ্য দমকল পরিষেবার আধুনিকীকরণ করবে কেন্দ্র

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ যে কোনো ধরনের দুর্যোগ জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল বা এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে তাদের সংস্থান শক্তিশালী করার জন্য অর্থ প্রদান করে। কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য দমকল পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণে ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে চায়। এর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রাজ্যগুলিকে আইনি ও পরিকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং দুর্যোগের সময় প্রাণহানি রোধ করতে এবং ন্যূনতম সম্পত্তির ক্ষতি নিশ্চিত করে ভারতকে দুর্যোগ প্রতিরোধী করে তুলতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের অধীনে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি মোট খরচের ২৫ শতাংশ বহন করবে, অপরদিকে উত্তর-পূর্ব এবং হিমালয় রাজ্যগুলি খরচের ১০ শতাংশ বহন করবে।

জাতীয় মহাসড়ক বরাবর বেড়া স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ সড়কে দ্রুতগামী যানবাহনের সামনে গবাদিপশু এসে যাওয়ার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এবং গবাদিপশু এসে যাওয়ার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এবং গবাদি পশুর পাশাপাশি যাত্রীদেরও জীবনের ঝুঁকি দেখা যায়। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে কৌশল তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়করি গবাদিপশুর বেড়ার এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। বহুস্তর বিশিষ্ট বেড়া বসিয়ে গবাদি পশুর রাস্তা পার হওয়া এবং বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটানো এড়ানো সম্ভব। তিনি জানিয়েছেন যে বেড়াটি ১.২০ মিটার উঁচু হবে এবং জাতীয় সড়ক- ৩০-এর প্রসারিত ২৩ অংশে এটি স্থাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছত্তিশগড় সফরের প্রস্তুতির জন্য এই প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বাঁশের ব্যবহার করা হবে, যা একে কার্যকরী ও পরিবেশবান্ধব করে তুলবে। ক্রিয়োজোট তেল এবং এইচডিপিই প্রলেপ করা এই বাঁশের বেড়াগুলি ইস্পাতের সুস্থায়ী বিকল্প।

এল নিনোর কারণেই বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিরক্ষরেখা বরাবর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উষ্ণাবস্থা হলো এল নিনো। ২০১৫ সাল থেকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাত, অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল ও তাপপ্রবাহ, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কারণ এই এল নিনো। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সমূহের আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের জিম্বাবোয়ে, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, মালাউই, সোয়াজিল্যান্ড, লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রায় ১০ কোটি মানুষ বর্তমানে খাদ্য ও জল সংকটের সম্মুখীন। এল নিনো চলতি বছরে ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ইউনিসেফ জানিয়েছে, ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনোর কারণে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও খরায় চিকিৎসা ও পুষ্টিহীন শিশুদের জীবন হয়ে উঠেছে বিপন্ন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় থেকে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সেবায় খাদ্য সহায়তার প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ও ফেমিন আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমস্ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে ফসল উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এল নিনো।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার পুরশুড়া শাখার স্বয়ংসেবক এবং প্রাক্তন প্রচারক পার্থ বেরার মাতৃদেবী বিমলা বেরা গত ১৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ২ পুত্র ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক।**

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ
ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস
এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা
নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প
সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা